২০২১ সাল ও আসন্ন দিনগুলোর ভয়াবহতা

লেখকঃ মোহাম্মদ জুন্দুল্লাহ

Researcher of Conspiracies against ISLAM,

Islamic Eschatology, &

Islamic Cosmology.

বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম

ভূমিকা

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ।

দাজ্জালি মিডিয়ার গভীর সব ষড়যন্ত্র ঘটছে আমাদের অজান্তে, অসচেতনতার দরুণ আমরা অধিকাংশই আজ গাফেল, ঘুমন্ত। উম্মাহ'র দারুণ খারাপ সময় পার হচ্ছে, ধেয়ে আসছে একের-পর এক বিপদ ।

বিষয়গুলোর এতটাই সূক্ষ্ম ও ফিতনা এমনই গভীর যে আলেমদের থেকেও এসব নিয়ে কোনো সতর্কবার্তা আসছে না, সাধারণদের থেকেও তেমন নয় ।

এমতাবস্থায়, রব্বুল আলামীন এই অধমকে যতটুকু জানিয়েছেন তার থেকে যতটুকু পাবলিকলি জানানো সম্ভব সেই প্রয়াস থেকেই "২০২১ সাল ও আসন্ন দিনগুলোর ভয়াবহতা" সিরিজটি লিখা শুরু করি ও ২১টি পর্বে সমাপ্ত হয়। যা প্রচার করেছি আমার মূল ফেসবুক গ্রুপ "ফিতনাময় দুনিয়া (UNSYSTEMATIC WORLD)" এ । দেয়ার পর থেকেই প্রচুর আবেদন আসছিল যেন লিখাগুলো একত্রে PDF আকারে ছাড়ি, যদিও এটি আমার পরিকল্পনায় ছিল না এখন, আমি এসব বিষয় আরো বিশ্লেষণ এর সহীত ও আরো গভীর সব বিষয় ভবিষ্যতে আমার ব্লগে দিব ইনশাআল্লাহ, এটাই ফিক্স ছিল । মালিক তাউফিক দিলে তাই হবে ইনশাআল্লাহ, কিন্তু সিরিজটা আপাতত ফেসবুকেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা, কিন্তু ভাই-বোনদের থেকে প্রচুর আবেদন আসতে থাকায় লিখাগুলো একত্র করে PDF সংকলনের কাজটি করছি । এখানে আপনি যা যা পাচ্ছেন তা একত্রিত অবস্থায় গোটা বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

এটি পাবলিকলি আমার অফিশিয়াল প্রথম কোনো বই, ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ।

এখানে দেয়া প্রতিটা তথ্যই গবেষণালব্ধ যা মেইনস্ট্রিম মিডিয়া আপনাদের থেকে গোপন রাখে বিধায় হজম করতে স্বাভাবিকভাবেই কষ্ট হবে, মনে সংশয় রয়ে গেলে সিম্পলি ২ রাকআত ইস্তেখারার সালাত আদায় করে নেবেন ।

ফেসবুক থেকে সিরিজটি শেয়ারের সময় উক্ত গ্রুপের নাম+লিংক উল্লেখ করে দেবেন ও এই বইটিও ডাউনলোড লিংক দিয়ে শেয়ার করতে পারবেন। বস্তুত, আমার সব লিখা-ই শেয়ার করতে পারবেন, উম্মাহ'র জন্য উন্মুক্ত রেখেছি সব। তবে লিখা কপি'র শর্ত একটাইঃ "আমার জন্য দু'আ করে নিতে হবে"

বইটির মূল্যঃ ১। ২ রাক'আত সালাত আদায় করতে হবে ও মালিকের কাছে আমার জন্য দু'আ করতে হবে খাস মনে

২। মসজিদে ১০০টাকা দান করতে হবে, সামর্থ্যবান কেউ মিস করিয়েন না - সামর্থ্য মত দানের চেস্টা করবেন, যদি না পারেন তাহলে ৫০, তাও না পারলে ২০, আশা করি সবাই পারবেন ইনশাআল্লাহ ।

দুটোই আবশ্যক - ইহাই বইয়ের মূল্য

[শুধুমাত্র মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য লিখা]

বিষয়বস্তুঃ

পর্ব ১

এক নজরে ২০২১ সালকে ঘিরে সিক্রেট সোসাইটি গুলোর পরিকল্পনাসমূহ

এই পর্বটি ছবির সাথে মিলিয়ে পড়বেন

ইকোনোমিস্ট ম্যাগাজিন তাদের ১৯৮৮ সালের জানুয়ারির ২য় সংখ্যার প্রচ্ছদে প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার সমাপ্তির একটি ইঙ্গিত দিয়েছিলো। আর এটি প্রকাশ করা হয়েছিলো মুদ্রা ব্যবস্থায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণকে রহিত করার ১৯ বছরের মাথায়। সেই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালেও বিশ্বে একটি কৃত্রিম মন্দার সৃষ্টি করা হয়েছিলো, সেই সময়ে তারা সফল না হলেও ইউরোপের ঐক্য নষ্ট করতে এবং এর অর্থনীতিতে আঘাত করতে পেরেছিলো। ২০২০ সালে ইকোনোমিস্ট বেশ কয়েকবার বিশ্ব পরিস্থিতি এবং অর্থনীতির ধারা এবং নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে। এই প্রচ্ছদটি তার একটি অংশ মাত্র। তবে ঘটনাগুলো কখন সফল হবে সেই সময় কেউ জানে না। তারা শুধু চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখন দেখা যাক প্রচ্ছদটিতে তারা কি বলতে চেয়েছে।

◍ ১, ১৬। প্রায় ১০ বছর আগে থেকেই কিছু মানুষ একটি মহামারীর আশংকা করছিলো। তারা একে সিলিকন ভাইরাস বলে উল্লেখ করছিলো। এ থেকে বোঝা যায় একটি শ্রেনি আগে থেকেই পরিবেশে জীবাণু পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, যেটি তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে। আবার ১৬ নম্বরে জীবাণুর ছবিটি আরো

প্রকোট। হয়তে পরবর্তীতে আরো ভয়ংকর রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। আসলে, প্রচ্ছদের শুরু ও শেষে ভাইরাসের ছবি দ্বারা ইহা স্পষ্ট যে, সামনের বছরটাও এই বানোয়াট মহামারী দ্বারা পার হবে।

- ২। এই বছরের ডিসেম্বরের শেষ থেকে ২০২১ এর মার্চ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি করোনা ভ্যাকসিন বাজারে আসতে যাচ্ছে। ফলে মানুষ মনে করতে থাকবে তারা এখন নিরাপদ। কিন্তু ছবিটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ছবির পেছনে ছায়া আছে। কূটনীতি এবং রাজনীতিতে ‘ছায়া’ দিয়ে কোন ঘটনা বা বস্তুর ভিন্ন একটি প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয় বা সেই ঘটনা বা বস্তুর পেছনে থাকা উদ্দেশ্যকে বোঝানো হয় যা প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করে, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই পেছনের শক্তি বা প্রতিক্রিয়া ভালো কিছু হয় না। তাই ভ্যাকসিনের এই ছায়া থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, এর চূড়ান্ত ফলাফল ভয়ানক হতে যাচ্ছে। পরীক্ষামূলকভাবে যেসব ভ্যাক্সিন চালু হয়েছে ; প্রতিটাই ক্ষতিকর।

- ৩। করোনাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর মানুষকে এখন মাস্ক ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মাস্কের বড় সমস্যা হলো এটি দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলে ভেতরে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের একটি দেয়ালের সৃষ্টি হয়, এর ফলে মাস্কের ভেতরে গ্যাস জমে তরলে পরিণত হয়ে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলাফল হিসেবে মাস্ক পড়ার ২০-

৩০ মিনিট পর থেকেই আমরা অক্সিজেনের চেয়ে বিষাক্ত গ্যাস গ্রহণ করতে শুরু করি। এর জন্য আমাদের চোখ জ্বলতে থাকে, লাল হয়ে যায়, শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। এর চূড়ান্ত ফল ফুসফুসের প্রদাহ, এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে। হয়তো এই বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার জন্য ছবিতে ছায়া ব্যবহার করা হয়েছে।

৪, ৯। ইংল্যান্ডে প্রথম লক ডাউন তুলে নেয়ার মাস খানেক পরেই মাস্ক বিরোধী আন্দোলন হয়েছিলো, একই চিত্র দেখা গিয়েছিলো ফ্রান্স এবং আমেরিকাতেও। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে আমরা এ ধরনের আন্দোলন দেখতে পাচ্ছি। হয়তো প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে মানুষের মাস্ক বিরোধী মনোভাবকে বোঝানো হতে পারে। ৪ নম্বরে খেয়াল করলে দেখবো চিহ্নের নিচে স্পষ্ট আরেকটি চিহ্ন। মাস্কের পক্ষে নানান ধরনের তথ্য প্রচার করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে এর কোনই বিকল্প নেই। এ পক্ষের অবস্থানও যথেষ্ট শক্তিশালী। তার মানে ‘মাস্ক’ প্রশ্নে দু পক্ষই একটি তর্ক যুদ্ধের মধ্যে আছে। এখানে কেউ স্পষ্টত জয়ী নয়। তাই হয়তো স্পষ্টভাবে দুবার চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ৯ নম্বরে ছায়া চিহ্নটিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যা থেকে ধারণা করা যেতে পারে, ভবিষ্যতে বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের মনে তেমন কোন প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করার সক্ষমতা থাকবে না। এর কারণ করোনা বা কোন জীবাণু হয়তো হবে না, হবে রাজনৈতিক সংঘাত এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়। অর্থাৎ ৯ নম্বরের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, সামনে ক্ষমতাধর গোষ্ঠীই জয়ী হতে যাচ্ছে।

৫,৬,৭। ভবিষ্যতে পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ৫ নম্বরে সেটারই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এ বছরের জুলাই মাসের প্রথম সংখ্যাতেও তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আর ইংল্যান্ডের সেনাপ্রধান নভেম্বর মাসেই করোনার মধ্যে ৩য় বিশ্ব যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন। বাইডেন আর আমেরিকার ভবিষ্যত একই সুতায় গাথা। বাইডেনকে কেন্দ্র করেই আমেরিকার পতন হবে এটা বর্তমান পরিস্থিতি থেকেও কিছুটা আচ করা যায়। আমেরিকা পতনের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও আছে। ৬ আর ৭ নম্বর থেকে বলা যায়, দেশটির পতনের আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে বাইডেন। এবং আমেরিকার পতন আসন্ন ইনশাআল্লাহ। কেননা, আমরা পরাশক্তি হিসেবে যে আমেরিকা কে চিনতাম, সে আমেরিকার কর্তৃত্ব এখন ইসরাইলের হাতে, কেননা ইসরাইলই হবে দাজ্জালের প্রধান ঘাটি, ক্ষমতা আমেরিকার থেকে ইসরাইলে অনেকটাই হস্তান্তর হয়ে গেছে। আর এতে সামনে বাইডেনের প্রভাবে তা চূড়ান্ত রূপের দিকে যাবে ; তা স্পষ্ট।

৮। টিকটক একটি সস্তা আর পাগলাটে বিনোদন মাধ্যমের প্রতীক। সামনের দিনে এধরনের সাংস্কৃতিক প্রসার আমরা ব্যাপক হারে দেখতে পাবো। মানুষ যখন নাচ-গানের মতো সস্কা বিনোদনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে তখন তার সামনে বিনোদনের মোড়কে যাই দেয়া হোক না কেন সে তা গ্রহণ করবেই আর এ ধরনের বিনোদন প্রিয় মানুষ কখনো সময়সাপেক্ষ বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে

পারে না। কারণ নাচ-গান বা হৈ-হুল্লরের মধ্যে বেশি সময় থাকলে মস্তিস্ক তার বিশ্লেষণী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই এ ধরনের মস্তিস্ক আরেকজনের মতামত গ্রহণ করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে। এটি ৯ নম্বরের ছায়া প্রশ্নবোধকের ব্যাখ্যাও হতে পারে। অর্থাৎ মনে সন্দেহ থাকলেও প্রকাশ করার সক্ষমতা থাকবে না। স্বাভাবিক বোধ-চেতনা হারিয়ে মানুষের মাঝে প্রতিবন্ধী টাইপ আচরণ বাড়াতে ও ঘরে থেকেই মা-বোনদের উলঙ্গ নৃত্যরত দৃশ্য তুলে ধরতে পারার সফল মাধ্যম হলো এই টিকটক, যার মাত্রা ভবিষ্যতে আরো বাড়বে, স্পষ্টতঃ। আর ওদের উদ্দেশ্য শতভাগ সফল। টিকটক এর দ্বারা আমাদের দুচোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে ওরা সমাজের সুপ্ত প্রতিবন্ধীদের জাগিয়ে কি দারুণভাবে সমাজকে কলুষিত করতে সফল হয়েছে।

- ১০,১৩,১৭, ১৮, ১৯। ডলার সাইন, আমেরিকার পতন ও পরে ১৩নং এ অর্থনীতি ছবিঃ ইহা স্পষ্ট আমাদের নিকট যে ডলারের মূল্য হরহর করে কমবে এবং এরই অযুহাতে RFID chip including digital currency বিশ্বে সবার মাঝে আবশ্যক করা হবে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, বিষয়টা মাথায় রাখুন।

এখন বিশ্বে স্বর্ণের দাম বাড়লেও এদেশে তা কমিয়ে রাখা হয়েছে তবে নতুন নিয়ম করা হয়েছে যে, স্বর্ণ যে দামে কিনেছেন তা ফিরিয়ে দিলে ৮৫% টাকা ফেরত পাবেন। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা ভাল মনে হলেও পেছনে লুকিয়ে আছে গভীর

ষড়যন্ত্র। এতে করে ওরা মুসলমানদের কাছে যে অবশিষ্ট সম্পদ আছে তাও হাতিয়ে নিতে চায় কাগজের টাকার বিনিময়ে, পরে একদিন এই টাকা সরিয়ে সবাইকে চিপ নিতে বাধ্য করবে, বিটকয়েনের প্রচলন করবে। এসব সামনের পর্বগুলোয় বুঝবেন ইনশাআল্লাহ।

সামনের খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা হয়তো ব্যাপক ব্যবসা-বানিজ্য আর আর্থিক লেনদেন দেখতে যাচ্ছি। কিন্তু এখানেও ছায়া ব্যবহার করা হয়েছে। তার মানে এই আর্থিক কর্মকান্ডের দুটি দিক থাকবে, ১। কোন দেশ তার রিজার্ভ বাড়াবে ২। কোন দেশ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অস্বাভাবিক ঋণে জড়িয়ে পড়বে। এই দুটি ক্ষেত্রের ঝুকি হচ্ছে যখন ডলারের পতন হবে তখন এই দুই শ্রেণির দেশই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে। এই বিপর্যয় আটকাতে তখন দেশগুলো তার রিজার্ভের স্বর্ণ বা রূপা ব্যবহার করে হলেও তার অনিশ্চিত অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে চাইবে। ১৯ নম্বরে এটি বোঝাতে এর জন্যই হয়তো "Stimulus Fund" ব্যবহার করা হয়েছে,যেখানে দেখানো হয়েছে পৃথিবী তার নিজ নিজ আর্থিক সামর্থকে একটি জায়গায় গচ্ছিত রাখতে রাখছে। "Stimulus Fund" হচ্ছে সরকারের এমন ধরনের বিনিয়োগ যার মাধ্যমে সরকার তার অর্থনীতিকে পতনের হাত থেকে নিরাপদে রাখতে পারে। কিন্তু ১৭ নম্বরে এই সিস্টেমে 'BET' ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হলো যে, পরে কি হবে তা কেউ জানে না। বাংলায় একে 'বাজি' বলা হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে তারা ১৮ নম্বরে এই বিনিয়োগের পরিণতি বলে দিয়েছে-'HOLD', মানে বিনিময়ে কোন রাষ্ট্র

কিছুই পাবে না। এর উদাহরণ হিসেবে ভেনিজুয়েলার কথা পড়ছে। মোট কথা পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ মহা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। 'মিরর ভিউ' থেকেও এর ব্যাখ্যা নেয়া যেতে পারে। আমরা দেখছি একটা আর হচ্ছে তার উল্টোটা।

১১। পৃথিবী তার আধুনিকতা হারাতে যাচ্ছে। ১৯৭১ সাল থেকে বিশ্ব স্বর্ণ ভিত্তিক অর্থনীতি থেকে তেল ভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছে। ফল হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য পেয়েছে অস্বাভাবিক বিলাসী জীবন আর ইউরোপ-আমেরিকা পেয়েছে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ। আর নিজেদের ভূ-খন্ডকে সস্তায় উন্নতির অনন্য পর্যায়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এটি কলোনিয়ালিজমের বানিজ্যিক রূপ। এখানে গ্রীন এনার্জি বা নবায়নযোগ্য জ্বালানীর একটি প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এ ধরনের পাখা ব্যবহৃত হয়। এর ব্যাপকতা আমরা বর্তমানেই দেখতে পারছি। প্রতিটি উন্নত দেশ তাদের গাড়ি থেকে শুরু করে কলকারখানা চালাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বাড়াচ্ছে অথবা পারমানবিক জ্বালানী ব্যবহার করছে। এক কথায় পৃথিবী এখন জীবাশ্ম শক্তির যুগ থেকে বিদ্যুৎ শক্তি নির্ভর যুগে প্রবেশ করেছে। ফলাফল, জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবসা হ্রাস পেতে থাকায় মধ্যপ্রাচ্য আবার এক ভঙ্গুর অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে।

বিদ্যুৎ শক্তি নির্ভর পৃথিবীতে একবার সামরিক সংঘাত শুরু হলে রাষ্ট্রগুলোর এই শক্রি উৎসগুলোও যে আর থাকছে না তা এই টার্বাইনটির কৌণিক অবস্থান থেকে বোঝা যায়। পৃথিবীর মানুষ আধুনিক জীবনোপকরণ ব্যবহারের সুযোগ হারাতে

যাচ্ছে। আবার এর পেছনের ছায়াটিকে যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলেও বোঝা যায় নবায়নযোগ্য জ্বালানীর কথা বলে রাষ্ট্রগুলোকে এমন এক অবস্থানে আনা হয়েছে, যেখানে তাদেরকে খুব সহজে অকার্যকর করে দেয়া সম্ভব হবে।

১২। বর্তমানে চীন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির নাম, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে। চীন বিশ্বে প্রথম দেশ হতে যাচ্ছে যারা আগামি ২/৩ মাসের মধ্যে বিশ্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে Digital Currency প্রবর্তন করতে যাচ্ছে। হয়তো এ কারণে চীনকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও তারা জোর ঘোষণা দিয়েছে গোটা বিশ্বে ভ্যাক্সিন পৌছে দেয়ার।

১৪। ’বৈশ্বিক উষ্ণতা’, ’জলবায়ু পরিবর্তন’ বর্তমানে জনপ্রিয় এক রাজনৈতিক হাতিয়ার। যদিও আমরা গত ৫/৭ বছরে মরু অঞ্চলে ধারাবাহিক বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, বন্যা দেখছি। ছবিতে দাবানলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণতার সাথে দাবানলের ব্যাখ্যা সাংঘর্ষিক। এটার মূল উদ্দেশ্য হতে পারে দাবানল ইস্যুকে সামনে রেখে তারা বিশ্বে প্রতিটি দেশকেই একই নীতির আওতায় এনে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। মূলত ইহা প্রতিকীরূপে বুঝাচ্ছে, আসল লক্ষ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ এর বানোয়াট থিওরীকে ব্রেইনে আরো ইঞ্জেক্ট করা ও কেমট্রেইল'স ছড়ানো চালিয়ে যাওয়া।

১৫। তথ্যপ্রযুক্তি হচ্ছে সাড়া পৃথিবীর মানুষকে বিচ্ছিন্ন রাখার সবচেয়ে কার্যকরি মাধ্যম। আর বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠিকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজে লাগানোটা সবচেয়ে সহজ। আর করোনা এক্ষেত্রে ঘি এর কাজ করেছে। এখন মানুষ চাইলেও মানুষ কাছাকাছি আসতে পারছে না। "Zoom" এপ এর দ্বারা এটাই স্পষ্ট করে বুঝাচ্ছে যে ২০২০ এর ন্যায় ২০২১ এও অনুরুপ লকডাউন থাকবে ফলে অনলাইনে ক্লাস-কাজ চালাতে হবে। তাই তথ্যপ্রযুক্তিকে যোগাযোগের কার্যকর মাধ্যম মনে হলেও এর মাধ্যমে মানুষ সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে, বিষন্যতা আর একাকিত্বে ভুগছে। আর এই একাকিত্ব মানুষের মধ্যে হিংস্রতার জন্ম দেয়। যার অনিবার্য ফলাফল যুদ্ধ-বিগ্রহ ধ্বংস।

ওয়া আল্লাহু আ'লাম।

উল্লেখ্য, এসব তাদের পরিকল্পনা মাত্র, এর কতটুকু বাস্তবায়ন হবে তার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার, তবে যেহেতু এই ইকোনোমিস্ট ম্যাগাজিন ধারাবাহিকভাবে সিক্রেট সোসাইটিগুলোর প্ল্যানিং বিভিন্ন মেসেজের মাধ্যমে প্রায়শই প্রকাশ করে; তাই আপনাদের বোঝার-জানার সুবিধার্থে প্রতিটা পয়েন্ট ভেঙে ভেঙে লিখা হয়েছে যেন সতর্ক হতে পারেন।

পর্ব ২

Covid - 19 : মহামারী ভাইরাস নাকি ধাপ্পাবাজি ?
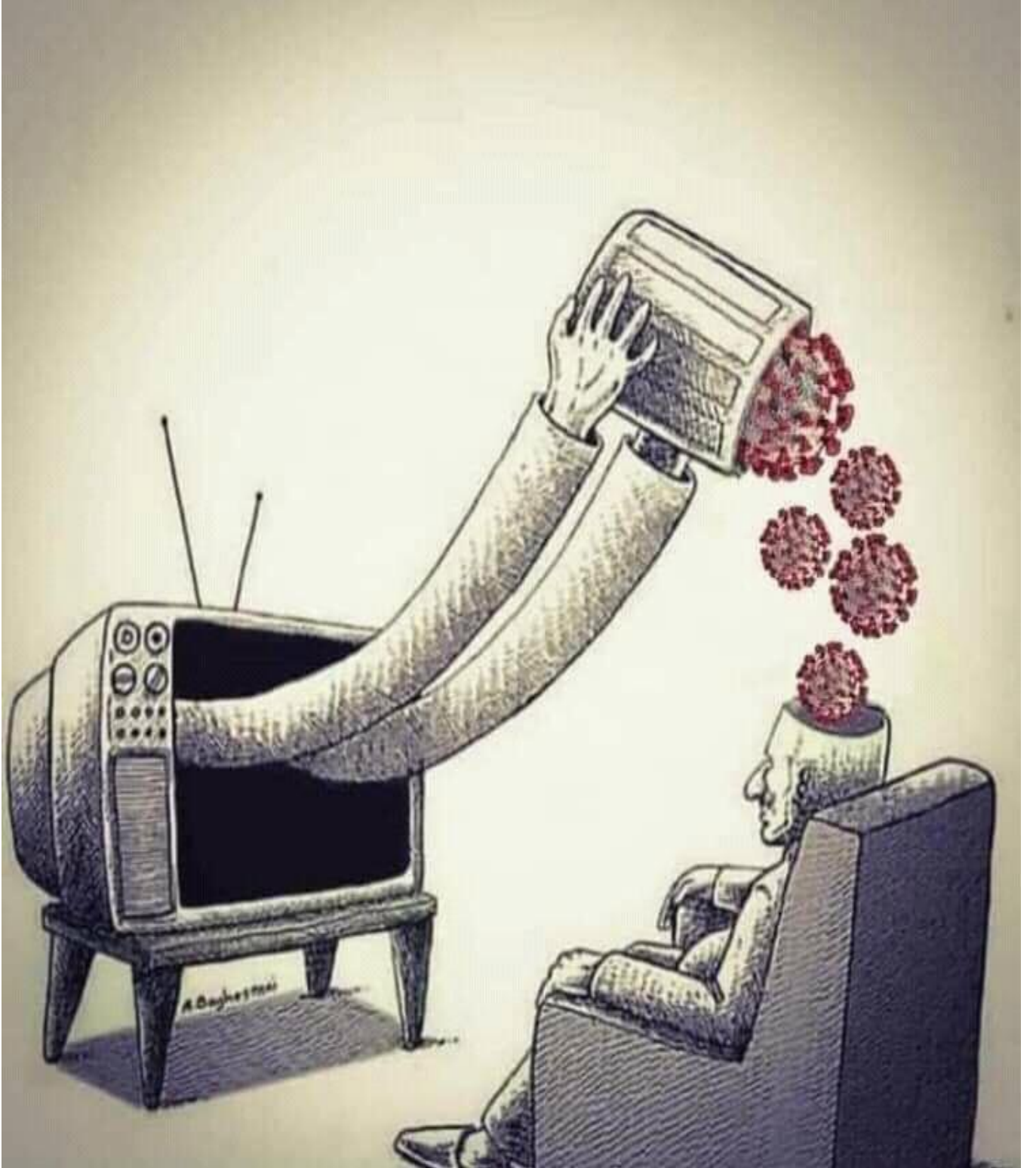
প্রথমেই সবাইকে অনুরোধ করব, মাথা ঠান্ডা করে রবের কাছে সত্য জানার স্পৃহায় নিজেকে সঁপে দিতে, নচেৎ সিরিজটির কিছুই বুঝবেন না।

আমরা দৈনন্দিন জীবনে যত নিউজ পাই তার প্রধান মাধ্যমগুলো হলো টেলিভিশন, নিউজ পেপার'স, ফেসবুক - ইউটিউব - টুইটার সহ সব সোশ্যাল মিডিয়া। এক কথায় এই কমিউনিকেশন সোসাইটির সবটুকুকে একত্রে মিডিয়া বলে। আর এই গোটা মিডিয়া জগতটাকে নিয়ন্ত্রণ করে কুফফার সম্প্রদায়।

তাদের অনুমতি ব্যতিত কোনো একটা সিঙ্গেল নিউজ মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় আসতে পারে না, আপনাদের যাদের সংবাদ মাধ্যমে পরিচিত লোক আছে তারা সবাই জানেন, "উপর থেকে অনুমতি" ছাড়া কোনো নিউজ ছাপা যাবে না, একই কথা প্রতিটা মাধ্যমের বেলায় প্রযোজ্য, যারা ফেসবুকে লিখালিখি করেন ; গুরুত্বপূর্ণ কিছু লিখবেন আর পোস্ট সরিয়ে দিবে না - তা হয় না। অর্থাৎ, আপনি যা কিছু জানতে পারবেন মিডিয়ার দ্বারা ; তা মূলত কাফিরদের নিয়ন্ত্রণে থেকেই পরিচালিত হয়। অতএব, কাফিররা আমাদেরকে যা জানতে দিতে চায় ; আমরা ঠিক তাই জানতে পারি - মেইন মিডিয়া গুলোর মাধ্যমে।

তো, এই Covid-19 ওরফে করোনা ভাইরাস খ্যাত ভাইরাসটার সূচনা কীভাবে? ২০১৯ এর ডিসেম্বর এ চীনের উহান থেকে এর সূত্রপাত। এই সূত্রপাত আমাদের কানে পৌঁছিয়েছে তথাকথিত সেই মিডিয়ার মাধ্যমে।

কিন্তু যারা শেষ জামানা নিয়ে গবেষণা করেন তারা আসন্ন এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানতেন, including me.

যেমন, ডিসেম্বর এ প্রথম প্রকাশ পেলেও WHO এর অঙ্গসংস্থা থেকে সেপ্টেম্বরেই ঘোষণা চলে এসেছিল যে অজানা একটা ভাইরাস আসতে চলেছে যার প্রধান লক্ষণ হবে হাচি-কাশি-হাপানি....কি, মিলে গেলো?

একটা ভাইরাস ধরা পড়ার ৩মাস আগেই কীভাবে ওরা বলে এই লক্ষণের ভাইরাস আসছে? যদিও এই নিউজ মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় আসেনি । যাহোক, আরেকটা ধাক্কা দেই, সরাসরি সিক্রেট সোসাইটির প্রচারিত একটা ভিডিও " I Pet Goat II " তে তারা আরো ৭বছর আগেই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিল যে চীন কে কেন্দ্র করে বিপর্যয় আসতে চলেছে যাতে তা "মরণব্যাধি ভাইরাস" হওয়ার ইঙ্গিত ছিল। কাফিরদের এসব ভবিষ্যতবাণীর ভুল অর্থ ছড়ানো হয়, আসলে তারা অবকাশ প্রাপ্ত, বিধায় আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে, বেশ সফলও হয় / হচ্ছে, কিন্তু প্রতিবারের ন্যায় বিজয় আমাদের হবে ইনশাআল্লাহ।

এটা ওদের দীর্ঘদিনের চক্রান্ত যে ওরা একটা ফেইক প্যান্ডেমিক ছড়াবে, আমরা তো মিডিয়া দ্বারা ব্রেইনওয়াশড, তাই মানব জীবনের সবচেয়ে কমন সিম্পটম গুলোকে নিয়ে ভাইরাসটার লক্ষণ হলেও আমরা অনেকেই সেসব গিলে বসে আছি।

আরে ভাই, মাস খানেক পর পর একটু সর্দি হওয়া, জ্বর হওয়া - এসব খুবই স্বাভাবিক। মৃত্যুর সময়ে সর্দি-জ্বর-হাপানি এগুলো কমন লক্ষণ, তাই এতে আক্রান্ত হলেই করোনা? মৃত্যুর আগে ওসব হলেই করোনা? অনেকে বলবেন, নিউমোনিয়া, ফুসফুস এর ক্যান্সার ইত্যাদি জটিল অবস্থার কথা। কেন ভাই, এসবে করোনা-ই কেন? করোনা আসার আগে কি মানুষের এসব হতো না?

বাস্তব জীবনের কথা বলি, করোনা আসার পর থেকে আমি মাস্ক ছাড়া বাইরে বাইরে ঘুরি, বাজার-মসজিদের জনসমাগম তো আছেই, বাসায় এসে অবশ্যই ফ্রেশ হতে হয় কিন্তু কাছাকাছি কোথাও গেলে বা বাজারে গেলে এসে হাত-মুখ ধোয়া কিছুই করিনি। এখনো আমার বাসার দোরগোড়ায় ভিক্ষুক আসে, আমি নিজ হাতে ওদের হাতে তুলে দেই। তো করোনা যদি থাকতই, এই ভিক্ষুক মানুষগুলো এখনো জীবিত কীভাবে? ওদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা তো সর্বনিম্ন!

কেন-ই বা আমি কিংবা যারা সত্য জেনে আমার মত চলাফেরা করেছে তাদের করোনা হলো না? আছে কোনো উত্তর?

করোনা ভাইরাস - এ এক জাস্ট ধাপ্পাবাজি রে ভাই!

এর কোনো অস্তিত্বই নাই, কোনোভাবেই আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না।

এর উপর বিশ্বাস পাকাপোক্ত করার জন্য বলা হয়েছে এটি নাকি মিউটেশনের মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে পরিবেশে টিকে থাকে। 😆😆😆 এই বিশাল মিথ্যার উদ্দেশ্য যেন দীর্ঘদিনের জন্য একে স্থায়ী রেখে ইচ্ছেমত ওরা ওদের প্ল্যান মাফিক কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

তাহলে মেডিকেল টেস্ট, ডেথ রিপোর্ট ইত্যাদি সব ভুয়া?

ওদের আসলে যা ডিরেকশন দেয়া হয় "উপর থেকে", তারা তার বাহিরে কিচ্ছুটি করতে পারে না, প্রতিটা দেশ চলে সরকারের মদদে, আর সব দেশের সরকার চলে দাজ্জালের চ্যালা-পালা তথা সিক্রেট সোসাইটিগুলো দ্বারা। ওরা একটা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে লকডাউন আনবে, লকডাউনকে কেন্দ্র করে ভ্যাক্সিন

আনবে, ভ্যাক্সিন কে কেন্দ্র করে RFID Chip বসাবে। অতঃপর প্রতিটা মানুষকে দাসের ন্যায় নিয়ন্ত্রণ করবে, কায়েম করবে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার !

সবগুলো পয়েন্ট নিয়ে আলাদা আলাদা আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

সব পড়া শেষে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ ।

এর সবগুলোই হচ্ছে দীর্ঘ পরিকল্পনা মাফিক, একের-পর এক, যত সময় ঘনিয়ে যাচ্ছে ততই দাজ্জাল আগমণের রাস্তা সাফ হচ্ছে । ঘনিয়ে আসছে দুর্দিন।

ইন্টারনেট থেকে অনেক প্রমাণ সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার অশেষ রহমতে এই মানবদেহ; জন্মের পর থেকে হাজারো রোগ-জীবাণূর সাথে লড়াই করে এখনো টিকে আছে। আর কোত্থেকে এক হাচি-কাশির ভাইরাস আসলো আর তাতে দিন-দুনিয়া থামিয়ে দিতে হবে? আমরা চরম ব্রেইনওয়াশড মিডিয়ার দ্বারা, ফলে ওরা যখন যা বলে তা ফ্যাল ফ্যাল গিলতে থাকি, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখিনা, সত্য জানতে চেয়ে অন্তরকে রবের কাছে পাঠাইনা, ফলে পদে পদে আমরা আজ

পর্যুদস্ত এক জাতিতে পরিণত হয়ে গোলামের জিন্দেগী পার করছি। আসলে এসব মহাদূর্দিনের শুরু, সামনের দিন গুলো আরো অনেক ভয়াবহ।

আরেকটা প্রশ্ন থাকে, সবাই যদি উপর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তাহলে যারা অসুস্থ হচ্ছে তাদের ব্যাপারে কি বলবেন? আপনিই বলুন তো, করোনা আসার আগে কি মানুষ সেসব রোগে-সমস্যায় আক্রান্ত হতো না? তখনো যেভাবে আক্রান্ত হতো এখনো সেভাবেই হচ্ছে, এতে করোনার অস্তিত্ব প্রমাণ হওয়ার বদলে উলটো আরো বিতর্কে পড়ে যায়।

আমার নিজের মাসখানেক আগে জ্বর-সর্দি হয়েছিল, শরীর খুব দূর্বল হয়ে পড়েছিল, কদিন পর এমনিই সুস্থ হয়ে যাই আলহামদুলিল্লাহ। আমার আগে আমার ফ্যামিলির সবার সেইম হয়েছিল, সবাই একই ভাবে সুস্থ হয়েছিল।

তো ডাক্তারের কাছে গেলেই বলত করোনা পজিটিভ, যা আপনাদের বেলায় হচ্ছে।

কেউ এখন মারা গেলে তাকে করোনায় মারা গেছে বলে চালান দেয়া কোনো ব্যাপারই না। কেননা মৃত্যুর সময়ে ওসব লক্ষণ যেমন স্বাভাবিক, উপরন্তু মৃত্যুর কারণ করোনা লিখে দিতে বাধ্য এরা।

বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ব্যাপার ভাই, আমি কস্মিনকালেও মনগড়া কিছু বলিনা আপনাদের, ঠিক তাই বলি যা গবেষণালব্ধ ।

.

আরেকটা দোহাই দেয়া যায় যে, কাফির দেশগুলোতেই তো মৃত্যু বেশি - এ উদাহরণ টা হচ্ছে ঐ নীল আর্মস্ট্রং এর চাঁদে গিয়ে আজান শোনার ন্যায়, যাতে করে মুসলমানদের অপবিজ্ঞান গেলানো সহজ হয়েছিল, সেই একই ফ্যালাসি ব্যবহার করা হচ্ছে করোনাকে সত্য প্রমাণ করে পরবর্তী এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়ন করতে । কি কি সেসব ইনশাআল্লাহ বিশদ আলোচনা করব এ সিরিজে, ধৈর্য ধরে সব পড়তে থাকুন, ইনশাআল্লাহ সবশেষে বিভ্রান্তি কেটে যাবে । হেদায়েতের মালিক কেবল আল্লাহ

.

আর অধিকাংশ মানুষ যা গ্রহণ করে নিবে সত্য হতে দূরে থাকবে, বিপথগামী হবে (ঠিক যেরকম অধিকাংশ মানুষ করোনায় বিশ্বাস করে) বিধায় দাজ্জালের ফিতনায় বেশি পড়বে। অধিকাংশের মতকে নিয়ে কুরআন কি বলে জানতে পড়ুনঃ

https://m.facebook.com/groups/200531811777856/permalink/202709598226744/

[just 40+ ayat proving that, the majority don't follows the right path]

আপনারা যারা এখনো মানতে পারছেন না, সিম্পলি ২ রাকআত এস্তেখারা সালাত আদায় করে নিন, ইনশাআল্লাহ সত্য জানতে সক্ষম হবেন।

আর এটি আমার কোনো মনগড়া বক্তব্য নয়, হজমে কষ্ট হওয়ার কারণ -

""সত্য সবসময়ই তিতা লাগে""

ও মিডিয়ার কাজগুলো বক্তব্যগুলো আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে গেথে যায় এমনভাবে যে মন সেটাকে সত্য বলে ধরে নেয়, আমরা ঘুমিয়ে গেলে অবচেতনে মনে থাকা তথ্যগুলো ব্রেইন রিভাইস করতে থাকে অটোম্যাটিকভাবে, তখন ঐ অবচেতন মনের তথ্যগুলো "সত্য" হিসেবে ব্রেইনে সেট হয়।

তাই মেইনস্ট্রিম মিডিয়া থেকে যথাসম্ভব দুরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয় ।

পর্ব ৩

মাস্ক

বোঝা যায় কিছু? পূর্বের দাসদের ন্যায়-ই ট্রিট করা হচ্ছে আমাদের

- **মাস্ক ব্যাবহারে করোনা থেকে সুরক্ষার বাস্তবে কোনই প্রমাণ নেই।**

কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide) গ্যাস নিশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করা আমাদের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটা একটা FACT, যা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। (১)

আমাদের নিশ্বাস থেকে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয় না।

মাস্ক পরলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের অক্সিজেন গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়, এবং আমরা যে বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ করি, সেটাই আবার আমরা শ্বসন (Inhale) করি।

আমরা নিশ্বাস এর মাধ্যমে যা কিছুই শরিরের ভিতরে নেই, এগুলি সরাসরি আমাদের রক্তের সাথে মিশে যায়। কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্তের সাথে মিশলে রক্তের pH স্তর কমে যায়, যার কারণে রক্ত অম্লীয় (Acidic) হয়ে উঠে। এই অম্লীয় ও অক্সিজেন স্বল্পতার পরিবেশে শরীরে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের কোষ (cell), এবং কান্সার সহ আরও অনেক রোগের কোষ অধিক মাত্রায় বর্ধিত হয়, যা একাধিক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত। (২)

এ ব্যাপারে একটা হাদিস উল্লেখযোগ্য -

"আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন পানি পান করবে সে যেন তখন পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে।"

-- সহিহ বুখারি, ৫৬৩০ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১১৫)

আমাদের নবীজি (স) এর যামানায় এর ব্যাখ্যা হয়তোবা কারো কাছেই ছিলো না, কিন্তু এখন আমরা জানি যে আমাদের নিশ্বাস থেকে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইড পানির উপর ছাড়লে সেটা পানির সাথে মিশে কিছুটা বিষাক্ত হয়ে যায়, ফলে সেই পানি আমাদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায়।

এটা সাধারণ জ্ঞান দিয়েই বুঝা যায়, যেসব জিনিস আমাদের শরির থেকে নির্গত হয়, সেগুলি সবই শরিরের অপ্রয়োজনীয়, বর্জিতাংশ (Garbage)। এগুলি পুনরায় শরিরে গ্রহণ করা কোনভাবেই কাম্য নয়। এটা বুঝতে কোন গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

মাস্ক পরলেই যে আপনি এই কথিত করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন, এরকম ভেবে থাকলে আপনি ভুল করছেন। মাস্ক ব্যাবহারে করোনা থেকে সুরক্ষার বাস্তবে কোনই প্রমাণ নেই।

[করোনা-ই যেখানে নেই, সেখানে এর আবার কিসের প্রতিরোধ?]

অনেক বিজ্ঞানী, এবং ডাক্তারগন মাস্ক পরার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তাদের এসব বক্তব্য মূলধারার মিডিয়াতে আসে না বলে আমরাও জানতে পারি না। যুক্তরাজ্যের ডেপুটি চীফ মেডিকেল অফিসার সরাসরিই বলেছেন, যে মাস্ক ব্যাবহারে করোনা থেকে সুরক্ষার যথাযথ কোন প্রমাণ নেই।(৩)

ইউরোপের দেশ Sweden আজ অবধি যেরকম ভাবে কোন lock down করেনি, তেমনি ভাবে তারা তাদের জনগণকে জবরদস্তিমূলক মাস্ক ব্যবহারে বাধ্য করেনি। (৪) অথচ Sweden এর পাশের দেশগুলির তুলনায় তাদের করোনা আক্রান্ত ও মৃতের হারও কম।

○ মহামারীর উছিলা দিয়ে নামাজকে নষ্টের পায়তারা:

কার দাসত্ব চলছে এখানে? আল্লাহর? নাকি পশ্চিমাদের বলা নির্দেশনার?

বিপদের মুহূর্তে (রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায়) মুখে মাস্ক পরে নামাজ আদায় করাতে শরিয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। (আদ্দুররুল মুখতার: ১/৬৫২, রদ্দুল মুহতার: ১/৬৫২) । তবে স্বাভাবিক অবস্থায় মাস্ক কিংবা অন্য কিছু দিয়ে নাক, মুখ ঢেকে নামাজ আদায় করা মাকরুহ।

রাসুল (সা.) ওভাবে নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যেকোনো ব্যক্তিকে

নামাজরত অবস্থায় তার মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৯৬৬)।

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজের সময় কাপড় ওপর থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিতে ও মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদিস: ৬৪৩)

উল্লিখিত হাদিসগুলোতে নাক, মুখ ঢেকে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হলেও, অসুস্থতা ও অপারগতার বিষয়টা ভিন্ন। ইসলাম কখনোই মানুষের ওপর তার সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেয় না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ কারো ওপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬)।

আর মহিলাদের নিকাবের ব্যাপার আবার আলাদা জিনিস, মাস্কের সাথে এটাকে গুলিয়ে ফেলবেন না,

পর্দা এক ফরজ বিধান, এটি কেবল কল্যাণই বয়ে আনে, ব্যক্তিগত সমস্যা বাদে কখনই এমন নজির দেখা যায়নি যে নিকাব/পর্দা-য় কারো ক্ষতি হয়েছে, বরং এতে আল্লাহ্‌র বারাকাহ্‌ আসে ।

লিঙ্কঃ ১) https://en.wikipedia.org/wiki/Hypercapnia

২) https://medicalxpress.com/.../2019-03-acidic-environment...

৩)https://www.rt.com/.../499429-evidence-masks-effective.../

৪)https://www.globalresearch.ca/twice-many-deaths.../5724346

লকডাউনের behind the scenes

ইতিমধ্যেই আপনাদের অনেকেই বুঝতে পারছেন যে করোনা ভাইরাস কত বড় এক ধাপ্পাবাজি। ভাইরাসটাকে ব্যবহার করে দাজ্জালের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার গঠনের পূর্বশর্ত ছিল পুরো পৃথিবীতে একটা সিস্টেম্যাটিক লকডাউন বাস্তবায়ন করতে পারা এবং এতে তারা শতভাগ সফল। উপরে ছবিটা দেখুন, দ্য ইকোনোমিস্ট ম্যাগাজিন (যারা প্রায়শঃ সিক্রেট সোসাইটির প্ল্যান তুলে ধরার পাশাপাশি সফলতাও তুলে ধরে) তারা কি পোস্টার দিয়েছিল বৈশ্বিক লকডাউনের পর। "Everything's Under Control. Big Government, liberty the virus". অর্থাৎ ওরা সরাসরিই যেখানে বলে দিচ্ছে যে সবকিছু এক

বড় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে, ভাইরাসটা এখানে সহায়ক, কিন্তু আমরা জাস্ট থিওরি বলে এগুলোকে ছুড়ে ফেলে দেই। ছবিতে লক্ষ করুন, একটা মাস্ক পড়া কুকুরকে এক মাস্ক পড়া লোক গলায় দড়ি পেচিয়ে ধরে আছে, সেই লোককে আবার ধরে আছে বড় এক হাত। বস্তুত, সেই পোষ্য কুকুরটা হলাম আমরা! জ্বী ভাই আমরা, সেই মানুষটা হলো সরকার ও বড় হাতটা হলো দাজ্জালের, যার অধীনে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে; বিশ্ব ধেয়ে গেছে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর দিকে।

.

লকডাউন দ্বারা যে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার হার মোটেও কমেনি তার যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত আছে। আপনারা মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় ঘাটাঘাটি করলেও পাবেন, নিচে আমি জরুরী লিংক দিয়ে দিব অবশ্য।

.

সেই শুরু থেকে দেখে আসছি, গোটা বিশ্বের যাবতীয় সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ এমনকি খেলাধুলা পর্যন্ত চলছে, অথচ যখনই সাধারণ জনগণের ব্যাপার আসে তখনই সেখানে বসে লকডাউন! এহেন ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের মানে কি ভাই?

বড় বড় যত কোম্পানি আছে সব খোলা অথচ আপনি কর্মস্থলে গেলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলে, স্পেশালি মসজিদে গেলেই আপনাকে করোনা ধরবে, ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকে না?

ঘুমিয়ে থাকলে দুনিয়ার ভন্ডামি ধরতে পারা যায় না রে ভাই, চোখ মেলুন, রবের নিকট সপে দিন নিজেকে, সামনের দিনগুলো আরো অনেক বেশি ভয়াবহ।

মসজিদকে মুছল্লি শূণ্য করা কাদের এজেন্ডা:

কোনোরকম ঝামেলা ও বিরোধিতা ছাড়াই তারা মুসলিমদের মসজিদে তালা ঝুলাতে পেরেছে, মুসলিমদের মসজিদে যেতে বাধা দিতে পেরেছে। তারা এবার

কথিত একটা ভাইরাসের ভয় দেখিয়ে মূলত মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাসকে কুপিয়ে ঝাঝরা করে দিয়েছে।

অনেকে হয় তো বলবে- মসজিদে তো তালা ঝুলানো হয়নি। আরে ভাই, ঢাকার একেকটা মসজিদে ইমাম থাকে ২/৩ জন, মুয়াজ্জিনও থাকে ২/৩ জন, খাদেমও থাকে ২/৩ জন করে। ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেম মিলেই তো ১০-১২ জন হয়ে যায়। বাইরের কেউ তো আর মসজিদে প্রবেশ করতে পারছে না। প্রশাসন তো আর সবকিছু মুখে বলবে না যে, মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি। কিছু বিষয় বুঝে তো নিতে হবে।

এখন কিন্তু মসজিদ বন্ধ করতে আর ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবীদের ডাকা হচ্ছে না। কারণ ওসব মৌলবীদের মুখ থেকে শুধু একটা ফতওয়া দরকার ছিল মিডিয়া ও সরকারের। তারা সেটা দিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার বিনিময়ে তারা আখেরাত বিক্রী করে দিয়েছে। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব দাবীদার ওসব মৌলবীদের এখন দুই টাকারও ভ্যালু নাই মিডিয়া ও সরকারের নিকট।

ইসলামের ইতিহাস বলছে- ইসলামের সব কিছুই মসজিদ কেন্দ্রীক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং চার খলীফা উনারা প্রত্যেকেই মসজিদ থেকেই সব পরিচালনা করেছেন। এমনকি হাদিসে এসেছে- “মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐসকল লোকদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছা পোষণ

করেছেন যারা মসজিদে জামাতে উপস্থিত না হয়। মহিলা ও শিশুদের কারণে তিঁনি জ্বালিয়ে দেননি।”

যেসব মৌলবীদের ফতওয়ায় আজকে মহানবীর পৃথিবী পরচালনার মূল কেন্দ্র এবং ইসলামের প্রধান নিদর্শন মসজিদকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সাধারণ মুসলিমদের উচিত সেসব মৌলবীদের গণধোলাই দিয়ে দেশ ছাড়া করা।

এখন যদি বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা বলে কুরবানী দিলে করোনা হবার কিংবা ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে তাহলেও ওসব মৌলবী বলবে যেহেতু কুরবানী দিলে করোনা ছড়ানোর সম্ভবাবনা রয়েছে সেহেতু

কুরবানী এবছর না করলেও চলবে। এমনকি তারা আইন করেও কুরবানী করা বন্ধ করে দিবে।

একটা বিষয় আপনারা বুঝতে ভূল করছেন কেন যে, কোন কমিউনিটিটা মসজিদ বন্ধ করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। দেখুন তারা কারা –

ডেইলি স্টার পত্রিকা বলছে যে, মসজিদ থেকেই করোনা দ্রুত ছড়াচ্ছে। [1]

বিবিসিও চাচ্ছে করোনার অজুহাতে মসজিদ বন্ধ হয়ে যাক। [2]

এদিকে ৭১ টিভিরও মাথা ব্যথা মসজিদ-মাদরাসা বন্ধ করা নিয়ে। [3] টকশোতে, ৭১ টিভির উপস্থাপিকা হুযুরদের চাপ প্রয়োগ করছে ঘরে নামাজ পড়তে। [4]

উপরের ইসলামবিদ্বেষী মহলটিই চেয়েছে মসজিদ বন্ধ হয়ে যাক। তাহলে এতো স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেন সাধারণ মুসলিমরা এখনও ঘরে নামাজ পড়ছেন? কেন ধর্মমন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার অন্তরালে ইসলামবিদ্বেষীদের নির্দেশনা পালন করছেন?

সুতরাং ইসলামবিদ্বেষীদের এজেন্ডাই হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিমদের মূল চেতনা মসজিদকে বিরান করে দেয়া, মুসলিমদের পারস্পরিক মেলামেশা বন্ধ করে দেয়া, ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু মসজিদকে বন্ধ করে দেয়া। তাই ঘরে নয়, মসজিদে যান পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমুয়া পড়তে।

হজ্ব করতে গিয়ে এখনো কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়নি [5]

অথচ সেই শুরু থেকেই এই অযুহাতে পবিত্র কাবা অবরোধ করে রেখেছে, আমরা ঘুমিয়ে আছি বলেই আজ এই শক্তি পেলো তারা।

সবাই মনোযোগ দিয়ে নিচের লিংক দুটো পড়বেনঃ

একসাথে অনেক কিছু জানতে পারবেন এখান থেকেঃ

https://williambowles.info/2020/05/01/the-farce-and-diabolical-agenda-of-a-universal-lockdown/

লকডাউন আনার পরিকল্পনা রকফেলার সোসাইটি থেকে ২০১৬ সালেই পাবলিশ করা হয়েছিল, অরিজিনাল ডকুমেন্ট সহ প্রমাণঃ

http://www.howardnema.com/2020/11/15/operation-lock-step-using-covid-19-as-an-authoritarian-weapon-for-social-control/

Wake up brothers !

রেফারেন্স-

সূত্র:১- https://bit.ly/2WsNTjX

সূত্র:২- https://bbc.in/3ajCHdi

সূত্র:৩- https://bit.ly/3beFcxG

সূত্র:৪- https://bit.ly/2wp1Kgx

সূত্র:৫-

https://www.somoyerkonthosor.com/2020/12/26/465832.htm

লকডাউনের behind the scenes.

সারা বিশ্বে ভ্যাক্সিন বিরোধী এবং লক ডাউন বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে। আমাদের পাশের দেশেও হচ্ছে কিন্তু মিডিয়া এ ব্যাপারে চুপ। এদের মধ্যে পাকিস্তানেই প্রায় এক ডজন ডাক্তার ভ্যাক্সিন বিরোধী আন্দোলনের জন্য গ্রেফতার হয়েছে।

ইউরোপ-আমেরিকার অনেক দেশেই এখন ভ্যাকসিনবিরোধী আন্দোলন হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে। বলছে, তারা করোনার ভ্যাকসিন নিতে চায় না।

কিন্তু অতি দুঃখজনক বিষয়, এই খবরগুলো মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে তেমন দেখা যায় না। কেমন যেন আড়ালে থাকে। যার দরুণ আপনি যখন বাংলাদেশে ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে বলবেন, তখন উত্তরে আপনাকে বলা হয়- "সারা বিশ্বের মানুষই দিচ্ছে, কেউ এর বিরুদ্ধে নয়, শুধু তুমি এর বিরুদ্ধে।" অথচ ইউরোপের যেসব দেশে করোনা ভয়াবহ আক্রমণ করেছে, তাদের দেশের মানুষও এই ভ্যাকসিন দিতে আগ্রহী নয়, আমেরিকাতেও নয়। তারা বলছে, "এর মাধ্যমে ভ্যাকসিন ব্যবসায়ীরা তাদের উপর এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে ভ্যাকসিনের অনেক ক্ষতিকর বিষয় তাদের চোখে ধরা পড়েছে।" তবে অনেক দেশে করোনার ভ্যাকসিন বাধ্যতামূলক করার প্ল্যান চলছে। হয়ত এমন শর্ত দিবে- "ভ্যাকসিন না নিলে অফিস আসতে পারবে না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে পারবে না, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলতে পারবে না"। যদিও প্রতিবাদের মুখে বিষয়টি বাধ্যতমূলক করা হয়নি।

বাংলাদেশের জনগণও যদি এর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবাদে না যায়, তখন বাংলাদেশেও এমন বাধ্যতামূলক করার প্ল্যান নেয়া হতে পারে। তাই ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে একত্র হয়ে শক্ত থাকা জরুরী।

ঘুমিয়ে থাকলে বাস্তবতা চেনা যায় না, wake up ! ! !

নিচে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘটতে থাকা লকডাউন ও ভ্যাক্সিন বিরোধী আন্দোলন এর যথেষ্ট ছবি দিয়ে দিচ্ছিঃ---

পর্ব ৪
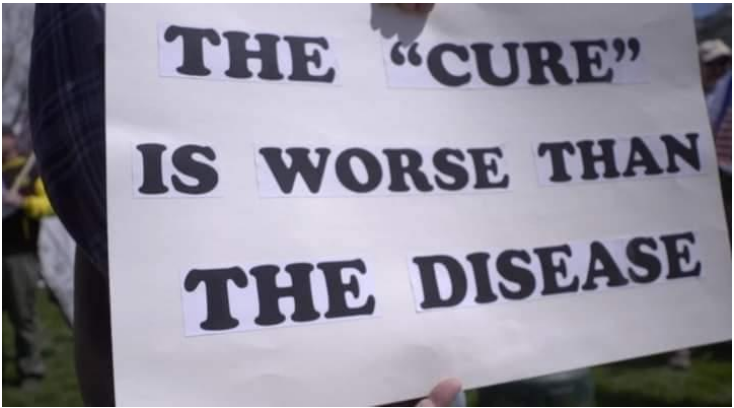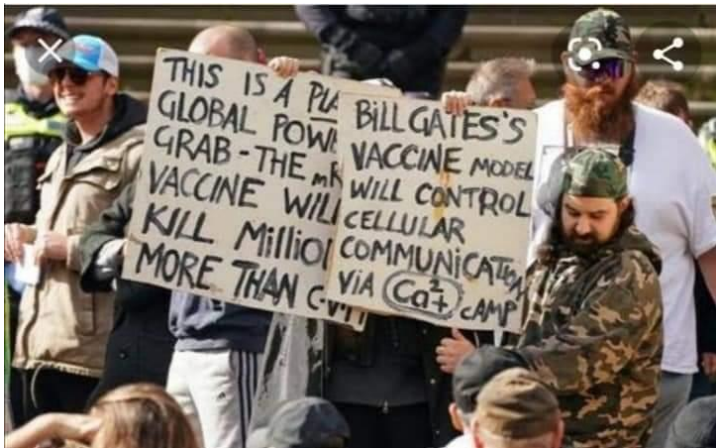
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারঃ দাজ্জালের দুনিয়ায় স্বাগতম!!
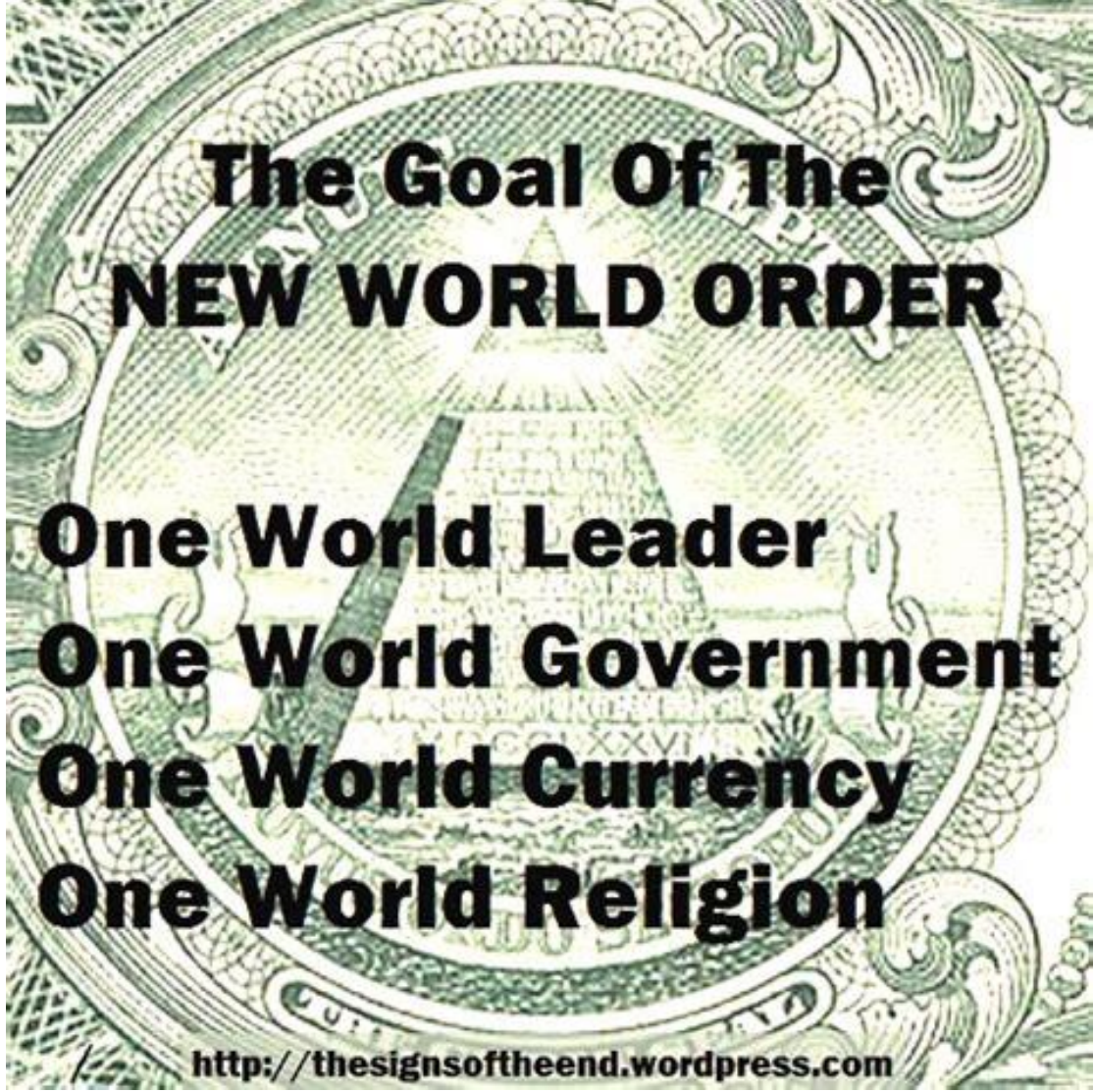
প্রথমে আপনাদের বুঝতে হবে New World Order (NWO) কি। আমরা জানি আমরা শেষ যুগের বাসিন্দা, কিয়ামতের প্রায় সব ছোট আলামত পুরণ হয়ে এখন বড় আলামত গুলো শুরু হই হই করছে যার ২য় আলামত হলো

দাজ্জাল ; যার আত্মপ্রকাশ আসন্ন ইনশাআল্লাহ। It's not like, সে আসবে হুট করে, মুহুর্তে বিশ্ব কব্জায় নিয়ে নেবে। তার আগমণের মঞ্চ নির্মাণের জন্য ওর চ্যালা-প্যালারা হাজার বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে ; দাজ্জালের অধীনে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ এ নিয়ে বিশ্বে এক সরকার শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য, তাই একে One World Order (OWO)ও বলে তবে প্রধানত এটা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নামেই পরিচিত।

এই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়ন এর পিছে সিক্রেট সোসাইটিগুলোর মাস্টার প্ল্যানিং এর অন্যতম হলো করোনা ভাইরাস। মিথ্যা একটা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে লকডাউন আনলো, অর্থনীতির পতন ঘটানোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে কাগজের মুদ্রা ব্যবস্থা সরিয়ে Bitcoin ও RFID Chip আনবে, সবাইকে মাস্ক পড়তে বাধ্য করে ওরা সফল, এবার ভ্যাক্সিনের নামে মুসলমান দের শরীরের বিষ ভরবে, হাতে RFID chip বসানোর মাধ্যমে সবাইকে দাসের ন্যায় নিয়ন্ত্রণ করবে, শুরু হবে এক বিশ্ব শাসন ব্যবস্থা। সংক্ষেপে এটাই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার তবে বিষয়টা আরো অনেক অনেক গভীর, আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে সামান্য আলোচনা করছি এখানে, ও সামনে পুনরায় করব ইনশাআল্লাহ।

- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়নের শক্তিশালী উপায় হলো করোনা ও লকডাউন:

- সামাজিক শর্তায়ন - Social Conditioning

সীমিত আকারে লকডাউন উঠানোর সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। মিডিয়ায় আমরা দেখতে যাচ্ছি রাস্তায় মানুষের ঢল। নিরাপত্তা প্রস্তুতি ছাড়াই সবাই ভীড় করছে রাস্তায়, গনপরিবহনে, বাজারে, শপিং মলে ইত্যাদি। সামাজিক দূরত্ব কেউ মানছে না, মাস্ক ব্যবহার করছে না ইত্যাদি। ফেবুতে গালমন্দ শুরু করবে সুশীল সমাজ। সেই ক্লিকবেইট নিউজগুলো ইচ্ছামত শেয়ার করবে। অনেকে রাস্তার ছবি তুলে দেখাবে কেউ দূরত্ব মানছে না, মানুষের কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, এই বুঝি সব মরে শেষ!

আমাদের মধ্যে যারা ভাইরাসের কারনে স্বজন হারিয়েছে তাদের কাছে এই বিষয়টা অনেক ভয়ংকর। এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন চলাফেরা কখনোই সমর্থন করার মত নয়। এটা Natural Human Reaction।

এমনই দায়িত্বজ্ঞানহীন অনেকে ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর তথ্য গোপন করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের মাধ্যমে ডাক্তার ও নার্সরা আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে বাড়তি রোগীদের চিকিৎসা করতে অন্য ডাক্তাররা হিমসিম খাচ্ছে। এ এক কঠিন বাস্তবতা। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ যখন জানতে পায় ভাইরাস পজিটিভ শুনলে তার স্বজনকে হাসপাতাল থেকে ফেরত দিবে না, তার মৃত্যু হলে সেখান

থেকেই দাফনে পাঠানো হবে, পরিবারের কেউ তার শেষ দেখা দেখতে পারবে না, তখন তথ্য গোপন করার মত উপায় তাদের মাথায় আসবে। এটাও Natural Human Reaction। [ঘটমানতার আলোকে বললাম, যদিও সেসব বানোয়াট, মানুষ জানেও না]

আবার আমরা যারা অফিসে না গিয়েও বেতন পাচ্ছি, লকডাউন উঠলে তাদের মন খারাপ হবে। ঘরে বসেই তো অফিসের অনেক কাজ করা যাচ্ছে, তাই অফিস খোলার দরকার ছিল না। গনপরিবহনে যাতায়াত করা ব্যপক ঝুঁকিপূর্ণ, সবার তো আর গাড়ি বা বাইক নেই। এটাও Natural Human Reaction।

কারও ক্ষেত্রে এই মাসের বেতনের উপর নির্ভর করছে আগামী মাসে কি খাবে, আবার কারও ক্ষেত্রে সকালের কাজের উপর নির্ভর করছে দুপুরে কি খাবে। প্রতিটি দেশেই এই মানুষদের সংখ্যা বেশি। যাদের ঘরে খাবার নেই আর ব্যংকে জমানো টাকা নেই, তারা রাস্তায় বের হবে কাজের জন্য, পরিবার নিয়ে এক বেলা পেট ভরে খাবার জন্য। এটাও সেই Natural Human Reaction।

ভাইরোলজির ভিত্তিতে মুলত লকডাউনকে জাস্টিফাই করা হয়েছে। সবাই ঘরে বসে থাকলে, বাইরে কারও সংস্পর্শে না গেলে ভাইরাস ছড়াবে না। খুবই বৈজ্ঞানিক কথা। যদিও দেখা যায় বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে মানুষের যাতায়াতছিন্ন একটি রণতরীতে ভাইরাস পৌঁছে যায়, ভাইরোলজির সংজ্ঞা

সেখানে কাজ করে না। আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মত লাখো মানুষের সমাবেশেও এই ভাইরোলজি কাজ করে না।

কিন্ত তাই বলে তো আর আন্তর্জাতিক সংস্থাদের প্রতি বিশ্বাস বন্ধ করা যাবে না। তাদের কথা না শুনলে জানা যায় না কিভাবে সন্ধ্যার পর একটি ভাইরাস কাজ শুরু করে। পায়ে হেটে চলাচল করা যায় কিন্ত রিকসা বা গাড়িতে করে গেলে ভাইরোলজি এ্যাকটিভ হয়। তাই সংস্থাদের কথা মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী।

ইভেন্ট ২০১ -এ বলা হয়েছে লকডাউন সাময়িকভাবে উঠানোর কথা। একটানা বছর+ লকডাউন রাখলে অর্থনীতির ক্ষতি হবে, সবাই নানা প্রশ্ন করা শুরু করবে, বিদ্রোহ শুরু করবে যা ইতিমধ্যে অনেক দেশেই শুরু হয়েছে। তাই মাঝে মধ্যে সাময়িকভাবে লকডাউন উঠানোর কথা বলা হয়েছে। তারপর স্কোরবোর্ডে বেশি বেশি নাম্বার দেখানো হবে যে মৃত্যুর হার বেড়ে যাচ্ছে। বুঝানো হবে অর্থনীতির কথা চিন্তা করাটা ভুল ছিল। লকডাউন পুনরায় জাস্টিফাই করা হবে, আরও কঠোর নিয়ম জারি করা হবে যাতে লকডাউনকে কেউ আর কোনদিন প্রশ্ন করতে না পারে। মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে কথা বলা যাবে না ইত্যাদি নিয়ম হবে।

এবারে আসা যাক মূল কথায়,

নিয়মিত আমাদের উপর সকল ধরনের Social Experiment চালানো হয়, আমাদের বিভিন্ন Task দেয়া হয়, আমরা তা পালনও করি কিন্ত টের পাই না। এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী যন্ত্র হচ্ছে টিভি আর ফেবু। এখানে একটা নিউজ ছেড়ে দেয়া হয়, সেগুলো দেখে আমাদের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। ঐ অনুযায়ী আমরা পোস্ট করি, কমেন্ট করি, মিম বানাই বা উল্লাসে মেতে উঠি। এভাবে আমাদের Natural Human Reaction পর্যালোচনা করা হয়। এখান থেকে সব দেশের রুলিং ক্লাস জানতে পায় কখন কোন বিষয়ে জনসাধারণের মতামত কেমন হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী কোন নিউজ ছাড়া হবে তা সীদ্ধান্ত নেয়।

যেমন চাল চুরি বা ধান কাটার সংবাদ দেখে আমাদের ওয়ালে আমরা যা পোস্ট করি, নিউজের কমেন্ট সেকশনে যা বলি, যেই পরিমান শেয়ার করি ইত্যাদি দেখে আমাদের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করা হয়। আবার প্রাইভেট vs. পাবলিক ইউনিভার্সিটি কিংবা ইউটিউব vs. টিকটক ইত্যাদি ইস্যু উঠিয়ে দিয়ে সেখান থেকেও মানুষের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়। সামাজিক মাধ্যমে একদিকে ফেলানি হত্যা বা দশ লক্ষ ভারতীয়দের চাকরি করা নিয়ে আমরা যেমন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করি, অন্যদিকে বারো মাস ভারতীয় বিনোদন, কস্মেটিক্স আর লেহেঙ্গার গুনাশুনও প্রকাশ করেই যাই। এগুলো যদিও অতি ক্ষুদ্র কিছু উদাহরণ তবে মূল বিষয় হচ্ছে, সামাজিক মাধ্যম থেকে রুলিং ক্লাস ধারনা নেয় কোন পরিস্থিতিতে

মানুষের মতামত কোন দিকে যাচ্ছে এবং সমাধানের নামে কোন নিয়ম তৈরি করে দিলে সবাই খুব সহজেই মেনে নিবে।

এসব সমাধানের জন্য আমাদের প্রস্তুত করাই হচ্ছে Social Conditioning বা সামাজিক নিয়ম/শর্তের জন্য প্রস্তুতকরন, নতুন শর্ত পালনের জন্য সবাইকে একটা পরিস্থিতি তৈরি করে দেয়া।

এখন থেকে আমাদের শিখানো হবে ৪ বা ৬ ফিট দূরত্ব পালন করে রাস্তায় চলাচল করা। গনপরিবহনে এক সিট ফাঁকা রেখে বসতে শেখা, দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলা, কারও সাথে হাত না মেলানো ইত্যাদি। রেস্টুরেন্টে একটি করে টেবিল ফাঁকা রাখতে হবে, দুইজনের বেশি বসা যাবে না, প্রিন্ট মেন্যু হলে ওয়ানটইম মেন্যু ব্যবহার করতে হবে, ওয়ানটাইম গ্লাস-প্লেট ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি। ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক সমাগম না করা বা পারিবার নিয়ে বেড়ানো বা শহরের বাইরে ভ্রমন বন্ধ করা ইত্যাদি। এভাবে বছরের পর বছর চলতে চলতে একদিকে আমাদের সামাজিক মুল্যবোধ যেমন কমে আসবে, অন্যদিকে সামাজিক ঐক্যবদ্ধতা বলে কিছু থাকবে না। প্রতিটি দেশের রুলিং ক্লাস ঠিক সেটাই চায়। একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ রুলিং ক্লাসের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

টিভিতে আমাদের দেখানো হচ্ছে বিশাল ফাকা অডিটরিয়ামে দর্শকের উপস্থিতি ছাড়া হোস্ট একাই প্রোগ্রাম করছে। ফাকা গ্যালারিতে খেলাধুলা দেখিয়ে

আমাদের পাবলিক গ্যাদারিং না করার সাথে অভ্যস্ত করা হচ্ছে। সংবাদ বা টক শোতে সবাই ভিডিও কলে অংশগ্রহন করছে। সেলিব্রিটি ইউটিউবাররা ঘরে বসে গ্রিন স্ক্রিনে ভ্লগ করছে। এভাবে আমাদেরকে প্রস্তত বা অভ্যস্ত বা Conditioning করা হচ্ছে।

(সাইড টপিকঃ US6506148B2 প্যাটেন্টটি খুজে পড়তে পারলে এমন শত প্রজুক্তির মধ্যে একটা দারুণ প্রযুক্তির কথা জানা যাবে।)

সামনে আসছে Contact Tracing। মোবাইল এ্যাপে দেখা যাবে রাস্তায় কতজন সুস্থ ও অসুস্থ মানুষ হাঁটছে। সিসি ক্যামেরা ও ক্ষেত্রবিশেষে ড্রোন দিয়ে নজরদারি করা হবে, সেই তথ্যও এ্যাপে অন্তর্ভুক্ত হবে। অসুস্থ কেউ আসতে নিলে এ্যাপ থেকে সংকেত দিবে। এখান থেকে জানা যাবে কোন অসুস্থ ব্যক্তি কোয়ারেন্টিন ভংগ করছে কি না, সে কাদের সংস্পর্শে গিয়েছে, তার থেকে দুড়ে থাকতে হলে কি করতে হবে, ভ্যাক্সিন দেয়া ও ভ্যাক্সিন ছাড়া কে আছে ইত্যাদি। এখানে আবার পয়েন্ট সিস্টেম চালু হবে। কেউ অসুস্থ ব্যক্তির কোয়ারেন্টাইন ভঙ্গের তথ্য দিতে পারলে পয়েন্ট পাবে, তা দিয়ে সে বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা পাবে। এভাবে সমাজের সাধারন মানুষ নিজেরাই নিজেদের নজরদারি করবে। একটি দেশের কর্তৃপক্ষের জন্য এর চেয়ে উপযোগী নজরদারি ব্যবস্থা আর সম্ভব না।

আমাদের নতুন প্রজন্মকেও এই Conditioning শিক্ষা দেয়া হবে। শিশু বয়স থেকেই আমরা তাদের শিখাবো অন্য শিশুদের কাছে যাওয়া যাবে না, বন্ধুদের বাসায় আনা যাবে না, একসাথে স্কুলের মাঠে খেলা যাবে না, একা একা গাছের মত দাড়িয়ে থাকতে হবে। ছোটবেলা থেকে রোবটের মত সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে, মুখ ঢাকা থাকবে, কেউ কারও চেহারা দেখবে না। সবাই যার যার বৃত্তের মধ্যে বেড়ে উঠবে, নিয়ম মেনে দক্ষ নাগরিক হয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। শুধু'সমাজ' শব্দটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে, সামান্য এটুকুই পার্থক্য।

- টেক দুনিয়ার অন্যতম বিগ বস বিল গেটস মাইক্রোসফট এর ব্যবসায় মনোযোগ কমিয়ে ভাইরাস আর মহামারীতে মনোযোগী কেন? গ্লোবাল ক্যাপিটালিস্ট ক্লাব ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (WEF) মহামারীর অনুশীলনে কেন?

সূত্রঃ https://www.newswise.com/articles/pandemic-exercise-featuring-global-business-government-leaders-to-highlight-preparedness

https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2019/2019-10-15-event201.html

ইভেন্ট’ ২০১ অনুশীলনের মাত্র দুই মাসের মাঝেই,৩১ ডিসেম্বর’২০১৯ তারিখে চীন WHO কে জানালো ভাইরাস সংক্রমণ এর কথা, এরপর একে একে ছড়িলে পড়ল ইউরোপ-আমেরিকা সহ সারা দুনিয়ায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করল মহামারী ।

World Economic Forum পৃথিবীর ১০০০টি শীর্ষ কর্পোরেট কোম্পানির (যাদের ন্যূনতম ৫ বিলিয়ন ডলার এর উপর টার্ন ওভার) অংশগ্রহণে পরিচালিত হয়।২০১৪ সালের হিসাব মতে এই ফোরামের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হবার বার্ষিক ফি ৬ লক্ষ্য ২৮ হাজার মার্কিন ডলার । সংযুক্ততা এবং ফোরামের কার্যাবলীর উপর ভর করে মেম্বার দের আবার স্তরভেদ আছে।অর্থাৎ বিষয় এবং গুরুত্ব অনুযায়ী সিদ্বান্ত গ্রহণের জন্য আলাদা আলাদা ফোরাম আছে যা পুঁজির পরিমাণ ও ক্ষমতা অনুযায়ী নির্ধারিত হয় । মূলত WWF হচ্ছে গ্লোবাল ক্যাপিটালিজম এর একটি নীতিনির্ধারনী ক্লাব।পৃথিবীর কোন অঞ্চলবিশেষ বা সারা পৃথিবীকে পুঁজির প্রয়োজন মাফিক কখন কিভাবে সাজাতে হবে তা নির্ধারণ করে মূলত এই এলিট ক্লাবের সদস্যরা।

গত এক দশক ধরে ভালো যাচ্ছিলো না ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম, ২০০৮ এ শুরু হওয়া মন্দার খুব টোটকা যে সমাধান দিয়েছিল তা এক্সপায়ারড হয়ে গেছে বেশ

আগেই, তাই আপাত দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়েছিল। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বিকশিত উৎপাদন শক্তির সরবোচ্চ রূপের প্রয়োগের এবং সে অনুযায়ী উৎপাদন সম্পর্কের নতুন করে বিন্যাসের, যাকে তারা নাম দিয়েছে ইন্ডাস্ট্রি-৪ বা ৪র্থ শিল্প বিপ্লব নামে।

নিউইয়র্ক, বেইজিং, টোকিওর পাশাপাশি ২০১৬ সালে সান ফ্রান্সিস্কো তে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এর লক্ষ্য নিয়ে WEF নতুন কেন্দ্রের যাত্রা শুরু করে । WEF এর মতে "This centre will serve as a platform for interaction, insight and impact on the scientific and technological changes that are changing the way we live, work and relate to one another."

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ২২-২৫ জানু'২০১৯ অনুষ্ঠিত ডাভোস, সুইজারল্যান্ড এর বার্ষিক সভার থিম ছিল - "Globalisation 4.0: shaping a global architecture in the age of fourth industrial revolution."

সোজা বাংলায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী করে তারা দুনিয়াটাকে সাজাতে চায় ।

সূত্রঃhttps://www.weforum.org/agenda/2019/01/everything-you-need-to-know-about-davos-2019/

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী দুনিয়া?

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু তে রয়েছে ইন্টারনেট, যাকে বলা হচ্ছে সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম বা ইন্টারনেট অব থিংস এন্ড ইন্টারনেট অব সিস্টেম। এটা ফিজিক্যাল, বায়োলজিক্যাল এবং ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড কে একসূত্রে গেঁথে ফেলবে । এটা এমন একটা ফান্ডামেন্টাল পরিবর্তন যা আমাদের জীবন যাপনের উপায়, কাজকর্মের ধরন, একজনের সাথে অন্যজনের সম্পর্কের ধরন, মানবিকতার ধারনা, অনুভূতি সবকিছুকে উলটপালট করে দেয়ার মত পরিবর্তন । এমন কি এই বিপ্লব মানুষের সংজ্ঞাকেও বদলে দেবে বলে ঘোষণা করা হচ্ছে ।

// ইন্টারনেট অব থিংস (IOT) —আমাদের প্রতিদিনকার যাপিত জীবন ও যাবতীয় ঘটনা সংযুক্ত থাকবে ইন্টারনেট এর সাথে এবং সেটা অন্য ডিভাইস সনাক্ত করতে পারবে, এবং যাবতীয় তথ্য বৃহৎ ডাটাবেইজে জমা হতে থাকবে । এখানে ব্যক্তি মানুষকে সক্রিয় হতে হবে না বরং ঘটনাই স্বয়ক্রিয়ভাবে ডেটা বা তথ্য বিগ ডেটায় জমা করতে থাকবে । ২০১৭ সালে শুরু হওয়া এই প্রযুক্তিতে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডিভাইস যুক্ত হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে আরও কমপক্ষে ৫০ বিলিয়ন কানেক্টেড ডিভাইস IoT তে সংযুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ।

// ইন্টারনেট অফ সিস্টেম—বিভিন্ন ব্যবসায়ীক কোম্পানি এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থা IOT নেটওয়ার্ক এ থাকা তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। নাগরিকের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-পারিবারিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়-রীতি-নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধ,বিশ্বাস-অবিশ্বাস,সম্পর্ক-বন্ধুত্ব,প্রেম-বিরহ,আচার-আচরণ,রুচি-অভ্যাস, তাপমাত্রা-রক্তচাপ,মৌনতা-যৌনতা সহ প্রত্যেকটা প্রকাশ্য ও গোপন তথ্যাদি জানতে পারবে। যে তথ্য ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের প্রচার-প্রচারণা,উন্নয়ন-বিপণন,আর রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নজরদারি-খবরদারি-নিয়ন্ত্রনের কাজে লাগাতে পারবে।

◍ যে সকল টেকনোলজিক্যাল টুলস কার্যকর করার মধ্য দিয়ে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব কে বাস্তবায়ন করা হবে তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলঃ

◦ আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলেজেন্স (AI) এবং মেশিন লার্নিং

◦ উন্নতমানের রোবটিক্স এবং অটোমশন

◦ ব্লক চেইন প্রযুক্তি

◦ 3D প্রিন্টিং

◦ কোয়ান্টাম কম্পিউটিং

◦ জিন এডিটিং

ডিজিটাইলাইজেশন ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণে কভিড এর অবদানঃ

কভিড-১৯ মোকাবেলায় একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কন্টাক্ট ট্রেসিং,সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আর লকডাউন। কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং এর মাধ্যমে মহামারী মোকাবেলার মডেল ইতিমধ্যে সফলভাবে প্রয়োগ করেছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট ৫জি'র দেশ চীন, দঃ কোরিয়া, তাইওয়ানসহ আরও অনেকগুলা

দেশে। IOT তে যুক্ত করে নিয়েছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডিভাইস । ডেটা হিসেবে কোটি কোটি মানুষ নিজেকে সমর্পণ করেছে বিগ ডেটায়। সমর্পণ করছে তার গোপনীয়তাকে, সমর্পণ করছে তার পুরনো মূল্যবোধকে। আর পুরো প্রসেসটাই সম্পন্ন হচ্ছে কভিড-১৯ কে উসিলা করে, মানুষের মৃত্যুভীতিকে কাজে লাগিয়ে। সাথে মিডিয়া কর্তৃক প্রতি মূহুর্তে আপনাকে এখানে এত মরলো, ওখানে অতো মরলো করোনায় - ইত্যাদি বাকোয়াস নিউজ দেখানো হচ্ছে আপনাদের আতংকিত করে রাখার জন্য, মানুষের হায়াত ফুরাচ্ছে ; মানুষ মারা যাচ্ছে বিবিধ কারণে, করোনায় নয়। পার্থক্য হচ্ছে করোনা ভাইরাস আসার পূর্বে আপনাদের সাথে ওভাবে আতংক ছড়ানো হয়নি বলে আপনারা বিন্দাস ছিলেন, তবে মিডিয়ার প্রতি অত্যাধিক নির্ভরশীলতা ১০০% সদ্ব্যবহার করছে তারা - আপনাদের মাঝে ফেইক আতংক ছড়িয়ে আপনাদেরকে কন্ট্রোল করার লক্ষ্যে।

লক ডাউন আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর মধ্যে থাকা মানুষ একদিকে যেমন তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন উপেক্ষা করতে পারবে না, তেমনি অন্যকোন মানুষের স্পর্শেও আসতে পারবে না। একমাত্র উপায় হিসেবে থাকছে 'প্রসেস উইদাউট হিউম্যান টাচ' ।দূরবর্তী যোগাযোগ। আলি বাবা, এমাজন এর মত ডিজিটাল মার্কেট প্লেসই ভরসা।ছোট বড় নানা বিপণন কোম্পানিও ব্যবসা বাঁচাতে

ডিজিটাল মার্কেট প্লেস এ প্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই। ক্যাশ টাকা রোগ ছড়ায়, স্পর্শ করা যাবে না ।

সো ডিজিটাল কারেন্সি তে পদার্পণ কর, ব্লকচেইন প্রযুক্তিতে সমর্পিত হও, ক্যাশ লেস সোসাইটিতে প্রবেশ কর। স্টে হোম, ওয়ার্ক ফ্রম হোম, অনলাইনে অর্ডার কর, অনলাইনে পে কর, ড্রোন এসে পোঁছে দিবে। বিলিভিং মেশিন ইজ সেইফার দ্যান বিলিভিং হিউম্যান বিং।আর্ট্রিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর রোবটিক্স এর সেবা গ্রহণ কর।ডিজিটাল এই প্রক্রিয়ার বাইরে আপনি এতদিন থাকতে পারলেও এখন আর পারছেন না।

- অটোমেশন-বেকারত্ব -লকডাউন-মাহামারিঃ

২০১৩ সালে এমাজনের কাছে ১০০০ টি রোবট ছিল, তিন বছরের ব্যবধানে সেটা গিয়ে দাড়ায় ৪৫০০০ এ। আর সে সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ্। যতধরনের পৌনঃপুনিক এবং রুটিন ওয়ার্ক এর কাজ আছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা রোবট তার প্রায় পুরোটাই দখল করে নেবে।আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর প্রয়োগে ফ্যাক্টরির মুনাফার হার ২০৩৫ সালের মধ্যে ৩৬% বেড়ে যাবে। এক

গবেষণায় দেখা গেছে যুক্তরাজ্যের বর্তমানের প্রায় ৪৫% চাকরি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব ।

McIKinsey Global Institute এর এক গবেষণা রিপোর্টে(recent study)দেখা গেছে এআই এবং অটোমেশনের প্রভাবে ইউরোপ আমেরিকার মত উন্নত দেশ সহ গ্লোবাল ওয়ার্কফোরসের এক পঞ্চমাংশ আক্রান্ত হবে। ৫০% কোম্পানি বিশ্বাস করে যে ২০২২ সালের মধ্যে অটোমশনের প্রভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফুল টাইম স্টাফ চাকরি হারাবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দুনিয়াজুড়ে প্রায় ৮০ কোটি (800 million workers)চাকুরের চাকরি কেড়ে নেবে রোবট। [master planning of AGENDA 2030 - সামনে আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ] ৪র্থ শিল্পবিপ্লব প্রায় প্রতিটা শিল্পখাতকে প্রভাবিত করবে, দ্যা ইকোনমিস্ট ভবিষ্যৎবানী করছে, বর্তমানের ৫০% চাকরিই (50% of job)অটোমেশনের ফলে ঝুঁকিতে পড়ে যাবে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম তাদের লেখনীতে বলছে, ২০২২ সালের মধ্যে কেবলমাত্র ২০টি উন্নত দেশেই ৭৫ মিলিয়ন চাকরি রোবট কেড়ে নেবে। কমতে কমতে বিলুপ্ত হতে যাওয়া চাকরিগুলোর মধ্যে রয়েছে - লোন অফিসার, রিসিপশনিস্ট, কেরানি, লিগ্যাল এসিস্ট্যান্ট, ড্রাইভার,ম্যানুফ্যাকচারিং শ্রমিক,

নির্মাণ শ্রমিক, সিকিউরিটি গার্ড, বাবুর্চি, ব্যক্তিগত আর্থিক উপদেষ্টা, তথ্য যোগাযোগ কর্মী, পাইকারি ও খুচরা পণ্য বিক্রেতা প্রভৃতি।তারা অবশ্য বলছে নতুন করে ১৩৩ মিলিয়ন চাকরির সুযোগ তৈরি হবে, তবে সে চাকরিগুলার ধরন ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে তারা যে ধারনা দিচ্ছে তা হল, আনুমানিক দুই-তৃতীয়াংশ শিশু যারা ২০১৬ সালে স্কুল শুরু করেছে,পেশাগত জীবনে প্রবেশ করে তারা যেসকল চাকরি করবে সেই সকল চাকরিগুলোর অস্থিত্বই এখনো তৈরি হয়নি।

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Towards_a_Reskilling_Revolution.pdf

[এগুলো জাস্ট গবেষণার তথ্য, ওরা যেমনটা চায় বা যা করতে চাচ্ছে তার সবই সত্য হবে এমন নয়, পরিসংখ্যান এর উপাত্ত আর কি]

অটোমেশন এর ম্যাসিভ এই প্রসেসগুলো ইন্সটল করার জন্য একটা চেইঞ্জওভার পিরিয়ড প্রয়োজন, লক ডাউন সেক্ষেত্রে একটা কার্যকর পন্থা।

এখন কথা হচ্ছে এই যে ৮০০ মিলিয়ন বা ৮০ কোটি মানুষের চাকরি ইন্ডাস্ট্রি-৪ কেড়ে নিবে, তাদের কি হবে? তাদের মধ্যে রি-স্কিল ট্রেইনিং এর মাধ্যমে কত জন নতুন প্রযুক্তিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবে? ক্যাপিটালিস্ট দুনিয়ায় আর্থিক বৈষম্যের মত শিক্ষা-দীক্ষা আর দক্ষতার বৈষম্যও প্রকট। প্রযুক্তির

নলেজে পিছিয়ে থাকা, কায়িক শ্রমে যুক্ত থাকা মানুষরা খুব একটা নতুন বাস্তবতার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে না ।

৫০-৫৫ বছর বয়সী ড্রাইভার এর মেশিন লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ রপ্ত করার সুযোগ অথবা সক্ষমতা না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তো পুজিবাদতো অর্থনৈতিক এ আবর্জনাকে বসাই বসাই পুষবে না । ভাইরাস আর মহামারীর নামে যদি প্রকৃতি বা বিধাতার কাঁধে বন্দুক রেখে কয়েক কোটি মানুষকে নাই করে ফেলা যায়, তবে একটা মহামারীর সিমুলেশন প্রোগ্রাম কেন নয়?? [লাগলে পুনরায় পড়ুন, সুক্ষ্ম বিষয়, বুঝার চেস্টা করুন] এরই মধ্যে তো মানুষ জীবিকার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে-লড়াই করবে। ২০০৮ এর মন্দায় জনতার লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা তাদের রয়েছে , অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট মুভমেন্ট, ১% বনাম ৯৯% ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম কে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল।এর পুনরাবৃত্তি নিশ্চয়ই তারা চাইবে না। তাই প্রয়োজন বায়ো-সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।কভিড মহামারী এক্ষেত্রে চমৎকার। নিপীড়িত মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া কে ঠেকাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আর লড়াই সংগ্রাম কে প্রতিহত করার জন্য দরকারি কারফিউ আর সামরিক মহড়া নিশ্চিত করবে লকডাউন।

ট্র্যাডিশনাল কন্সপিরেসি আর মডার্ন কন্সপিরেসির পার্থক্য করতে গিয়ে জুলিয়ান আসাঞ্জ তার Conspiracy as governance প্রবন্ধে লেখেনঃ

Literacy and the communications revolution have empowered conspirators with new means to conspire, increasing the speed of

accuracy of their interactions and thereby the maximum size a conspiracy may achieve before it breaks down.

পড়াশোনা ও যোগাযোগ-বিপ্লব ষড়যন্ত্রকারীদেরকে দিয়েছে নতুন নতুন উপায়ে ষড়যন্ত্রের ক্ষমতা। বৃদ্ধি করেছে তাঁদের নিজেদের ভেতরকার মিথষ্ক্রিয়াগত নির্ভুলতার গতি। এভাবে ষড়যন্ত্র লাভ করেছে তার সর্বোচ্চ আকার— ভেঙে পড়ার আগে একটা ষড়যন্ত্র যতটা বড় হতে পারে আর কি।

এই ছিল - করোনা ও লকডাউনকে ব্যবহার করে দাজ্জালি এজেন্ডার পরিকল্পনাসমূহ ।

পর্ব ৫

ভ্যাক্সিনঃ প্রতিরোধক নাকি বিষ? !

টিকার যতগুলো মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, তার মধ্যে একটি হলো ‘সাডেন ইনফেন্ট ডেথ সিনড্রোম’ বা শিশুর হঠাৎ মৃত্যু (SIDS-Sudden Infant Death Syndrome)। বেশ কিছু রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য বা রোগের বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টির জন্য আমরা অনেকেই এলোপ্যাথিক টিকাগুলো নিয়ে থাকি। যেমন-বিসিজি, ডিপিটি, এমএমআর, হাম, পোলিও, হেপাটাইটিস, এটিএস ইত্যাদি। অথচ টিকার (vaccine) মারাত্মক ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আমরা অনেকেই খবর রাখি না।

টিকার ক্রিয়াকৌশল হলো অনেকটা ‘কাটা দিয়ে কাটা তোলা’ কিংবা ‘চোর ধরতে চোর নিয়োগ দেওয়া’র মতো। যে রোগের টিকা আমরা নিয়ে থাকি, সেটি বস্তুত তৈরী করা হয়ে থাকে সেই রোগেরই জীবাণু থেকে। অর্থাৎ যে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস যে-ই রোগের সৃষ্টি করে থাকে, সেই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থেকেই সেই রোগের টিকা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে নাকি নানাবিধ জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘দুর্বল’ করে টিকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। টিকা মুখে খাওয়ানো হউক বা ইনজেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হউক, সবগুলোই এই তথাকথিত ‘দুর্বল’ কিন্তু জীবিত জীবাণু দিয়ে তৈরী করা হয়। এসব ভয়ানক ক্ষতিকর জীবাণুকে ‘দুর্বল’ করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে একই সাথে বিখ্যাত এবং পরবর্তীতে কুখ্যাত হয়েছিলেন ফ্রান্সের বিজ্ঞানী ‘লুই পাস্তুর’। কেননা লুই পাস্তুরের আবিষ্কৃত জলাতঙ্কের টিকা নিয়েই বরং বিপুল সংখ্যক লোক জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। দাবী করা হয়ে থাকে যে, জীবাণুদের এই ‘দুর্বলতা’ একটি স্থায়ী বিষয়; কাজেই তারা কখনও শক্তিশালী হতে পারে না এবং কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু নিরপেক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কারো শরীরে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে জীবাণুরা ঠিকই শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এবং ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করতে পারে। বাস্তবে এমন ভুড়িভুড়ি প্রমাণ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) এমন ঘটনা ঘটেছে।

আরেকটি চিন্তার কথা হলো, শক্তিশালী কেউটে সাপে দংশন করলে মানুষ মরবে আর দুর্বল কেউটে সাপে কামড়ালে মানুষ মরবেও না আর কোন ক্ষতিও হবে না, এমনটা বলা কতটা যুক্তিসঙ্গত? দাবী করা হয়ে থাকে যে, কোন রোগের টিকা নিলে শরীরে সেই রোগের বিরুদ্ধে একটি ক্ষণস্থায়ী প্রতিরোধ শক্তির (antibody) সৃষ্টি হয়; ফলে আগামী কয়েক বছর সেই ব্যক্তির ঐ রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এই দাবীর একশ ভাগ গ্যারান্টি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বোয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী অধিকাংশ ব্রিটিশ সৈন্যকে টাইফয়েডের টিকা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারপরও ৫১,০০০ সৈন্য টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল যাদের মধ্যে ৮০০০ সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় রাশিয়া-জাপান যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অনুসারে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের সৈন্যদেরকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছিল। ফলে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল মাত্র ৭০০০ সৈন্য যাদের অর্ধেক ছিল টাইফয়েডের টিকা নেওয়া এবং অর্ধেক ছিল টিকা ছাড়া। আবার গেলিপোলির যুদ্ধে সমস্ত সৈন্যকে আমাশয়ের টিকা দেওয়ার পরও ৯৬,০০০ সৈন্য আমাশয়ে আক্রান্ত হয়েছিল কেবল বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা যায়নি বলে। ১৯৪৮ সালে যুক্তরাজ্যে বাধ্যতামূলক বসন্তের টিকা নেওয়ার আইনটি যখন বাতিল করা হয়; তার পরের পরিসংখ্যানে কিন্তু যুক্তরাজ্যে বসন্ত মহামারীর সংখ্যা বা বসন্ত রোগে (small pox) মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে দেখা

যায়নি। মোটামুটি সকল টিকার শিক্ষা একটিই আর তাহলো পুষ্টিকর খাবার, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ইত্যাদির অভাবকে হাজারবার টিকা দিয়েও সামলানো যায় না। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো- শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করার পাশাপাশি টিকা নামক এই জৈব বিষ (Biological poison) অর্থাৎ জীবাণু মানুষের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বা ইমিউন সিস্টেমে (immune system) মারাত্মক বিশৃংখলার সৃষ্টি করে থাকে। আর এই বিশৃংখলার সুযোগে ক্যান্সারের মতো প্রাণঘাতী রোগ আমাদের শরীরে বাসা বাধার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে যায়। ইহা আজ প্রমাণিত সত্য যে, ইমিউনিটির সর্বনাশ না হলে শরীরে ক্যান্সার বা ম্যালিগন্যান্সি (malignancy) আসতে পারে না। পৃথিবীতে রোগ-ব্যাধিকে যিনি সবার চাইতে বেশী বুঝতে পেরেছিলেন, সেই চিকিৎসা মহাবিজ্ঞানী জার্মান ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান টিকাকে অভিহিত করেছেন- ‘মানবজাতিকে ধ্বংসের একটি ভয়ানক মারনাস্ত্ররূপে’। (mark the words)

টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা ক্ষতিকর ক্রিয়া এবং তা থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গবেষনা করেছেন ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ জে. সি. বার্নেট (Dr. James Compton Burnett, M.D.)। ১৮৮০ সালে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ক্লিনিক্যাল অবজার্বেশন থেকে ঘোষণা করেন যে, টিউমার এবং ক্যান্সারের একটি অন্যতম মূল কারণ হলো এসব টিকা। বার্নেট প্রথম

প্রমাণ করেন যে, থুজা (Thuja occidentalis) নামক হোমিও ঔষধটি টিকার অধিকাংশ ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিরাময় করতে সক্ষম। বার্নেটের মতে, মানুষ জন্মের সময় আল্লাহ্ প্রদত্ত যে স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায় তা হলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য (perfect health)। আর এই কারণে টিকা দিয়ে বা অন্য-কোন ঔষধ প্রয়োগে তাকে পরিবর্তন করা হলো একটি মাইনাস পয়েন্ট অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের ক্ষতি করার নামান্তর। তার মানে হলো টিকা দেওয়ার ফলে একজন মানুষ তার সবচেয়ে উত্তম স্বাস্থ্য থেকে বিচ্যুত/ অধঃপতন হলো। আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার মানে হলো অসুস্থ্য হওয়া। কাজেই টিকা নেওয়ার ফলে শরীরের যে অবস্থা হয়, তাকে সহজ ভাষায় বলা যায় অসুস্থ অবস্থা বা রোগ আক্রান্ত অবস্থা বা পীড়াগ্রস্থ হওয়া। স্টুয়ার্ট ক্লোজ (Dr. Stuart M Close, M.D.) নামক আরেকজন ব্রিটিশ চিকিৎসা বিজ্ঞানী টিকার ন্যায় যাবতীয় পাইকারী চিকিৎসাকে সম্পূর্ণরুপে ‘এক পাক্ষিক বা এক আঙ্গিক’ (unholistic) ঘোষণা করে ইহার নিন্দা করেছেন ; কেননা ইহা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংবেদনশীলতা (Susceptibility) নামক সার্বজনীন নীতির পরিপন্থী। সাসসেপটিবিলিটি নীতির মানে হলো একই ঔষধ একজনের উপকার করতে পারে, আরেকজনের ক্ষতি করতে পারে আবার অন্যজনের উপকার-ক্ষতি কোনটাই নাও করতে পারে।

হ্যারিস কালটার (Harris Culter) নামক একজন মেডিক্যাল ঐতিহাসিক এখনকার সমাজে মানসিক রোগ এবং অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধির জন্য এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য টিকাদান কর্মসূচীকে দায়ী করেছেন। টিকা কেবল আমাদের শরীরকে নয়, আমাদের মনকেও বিষিয়ে তুলেছে। মানুষের মধ্যে আজকাল যে উগ্রমেজাজ, প্রতিশোধ প্রবনতা, অপরাধে আসক্তি, কথায় কথায় খুন করার মানসিকতা, মাদকাসক্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায় তারও মূলে রয়েছে এই কুলাঙ্গার টিকা। বিশেষত বিসিজি টিকা শিশুদের মনে ধ্বংসাত্মক প্রবণতা সৃষ্টি করে। ইহার ফলে শিশুরা এমন দুর্দান্ত স্বভাবের হয় যে, তাদেরকে শাসন বা নিয়নত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরা হয় গোয়ার, কথায় কথায় মারামারি এবং ভাংচুড়ে ওস্তাদ। বর্তমানে প্রচলিত মারাত্মক মারাত্মক অনেক চর্মরোগেরও মূল কারণ এই টিকা। একটি ওয়েবসাইটে টিকা নেওয়ার ফলে শিশুদের যে-সব মারাত্মক মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছে, তাদের অনেকগুলো ছবি দেওয়া আছে, যা দেখলে যে কেউ শিউরে উঠবেন। সম্প্রতি একটি গবেষণায় ঈঙ্গিত করা হয়েছে যে, একিউট ডিজিজের পরিমাণ কমে গিয়ে এলার্জি, হাঁপানি, ডায়াবেটিস, টিউমার, ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ক্রনিক ডিজিজের সংখ্যা মহামারী আকারে বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে আছে এসব পাইকারী টিকাদান কর্মসুচী। কুলকান (Kulcan) নামক একজন ব্রিটিশ গবেষক লক্ষ্য করেন যে, মানুষের চুল টিকার দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। টিকা নেওয়ার ফলে কারো কারো চুল পাতলা হয়ে যায়, কারো কারো চুল পড়ে

যায় এবং কারো কারো ক্ষেত্রে অনাকাংখিত স্থানে বেশী বেশী চুল গজাতে থাকে। ডাঃ বার্নেট দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, টাক (Alopecia areata) পড়ার মূল কারণ হলো দাদ (Ringworm) এবং দাদের মূল কারণ হলো টিকা। এই কারণে দেখা যায় শহরে মানুষদের মধ্যে টাক পড়ে বেশী এবং গ্রামের মানুষদের মধ্যে টাক পড়ার হার খুবই কম ছিল; কেননা গ্রামের লোকেরা টিকা/ ভ্যাকসিন তেমন একটা নিতনা। তবে বর্তমান সময়ে গ্রামেও এ প্রবনতা দেখা যাচ্ছে কারন এখন গ্রামের লোকেরাও টিকা নিচ্ছে গনহারে।

সম্প্রতি ডাঃ রিচার্ড পিটকেয়ার্ন (Dr. Richard Pitcairn) নামক একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী আমেরিকার গৃহপালিত পোষা প্রাণীদের ওপর গবেষণা করে দেখতে পান যে, যেসব পশুদের টিকা দেওয়া হয়েছে তদের দাঁত ক্ষয় (dental caries) হয় বেশী বেশী। আমেরিকনরা কেবল পাইকারী হারে টিকা নিতেই অভ্যস্থ নয় বরং একই সাথে তাদের গৃহপালিত পোষা প্রাণীদেরকেও পাইকারী হারে টিকা দিতে ওস্তাদ। আবার একই অবস্থা দেখা গেছে মানুষের ক্ষেত্রেও ; টিকা না নেওয়া শিশুদের চাইতে টিকা নেওয়া শিশুদের দাঁত ক্ষয় হয় বেশী মাত্রায়। এমনকি গবেষণায় দেখা গেছে যে, টিকা নেওয়া শিশুদেরকে যতই পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো হোক না কেন, তাদের দাঁত ধ্বংস হবেই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাঁত ক্ষয় হয় দাঁতের বাহিরের দিকে মাড়ির কাছাকাছি (neck

lesions)। যেহেতু দাঁতের সাথে হাড়ের গঠনের খুবই ঘনিষ্ঠ মিল আছে ; তাই বলা যায় এসব টিকা আমাদের হাড়েরও ক্ষতি করে থাকে সমানভাবে। আর হাড়ের ক্ষতি হলে শরীরে রক্ত কমে যায় ; কেননা আমাদের রক্ত উৎপন্ন হয় হাড়ের ভিতরে (bone marrow) থেকে। আর রক্ত কমে গেলে বা রক্তের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন ক্রুটি দেখা দিলে মানুষ অস্থিচর্মসার বা কঙ্কালে (emaciated) পরিণত হয়। ডিপিটি টিকার কুফলে আপনার শিশুর তাৎক্ষণিক মৃত্যু হতে পারে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর ব্রেনও ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। ফলে সে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি বা অটিজমের (Autism) স্বীকার হতে পারে। অবশ্য অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে, হাম (measles), মাম্পস বা কণর্মূল প্রদাহ (mumps), হেপাটাইটিস এবং রুবেলা (rubella) ভ্যাকসিনেরও মানুষ এবং পোষাজন্তুদের ব্রেন ড্যামেজ করার ক্ষমতা আছে। বতমানে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি শিশুদের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সচেতন ব্যক্তিরা মানবজাতির ভবিষ্যত নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছেন। কেননা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নেতৃত্ব তো আজকের শিশুদেরকেই নিতে হবে। শিশুদের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিত্ব বা অটিজমে (Autism) আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ যে এইসব টিকা, তা অগণিত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ইন্টারনেটে সামান্য খোজাঁখুঁজি করলেই এসব টিকা নেওয়ার ফলে অগণিত শিশুর করুণ মৃত্যু, ব্রেন ড্যামেজ হওয়া, ক্যান্সার, টিউমার, ব্লাড ক্যানসার প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার এমন অগণিত কেইস হিস্ট্রি দেখতে পাবেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপে দেখা গেছে, যে-সব দেশে টিকা নেওয়ার হার বেশী, সে সব দেশে ক্যান্সারে মৃত্যুর হারও বেশী। শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো থেকে স্বয়ং তার পিতা-মাতা পোলিও রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। কেননা পোলিও টিকাতে পোলিও রোগের জীবিত ভাইরাস থাকে যা অনেকদিন পযর্ন্ত শিশুর মল-মুত্র-থুথু-কাশিতে অবস্থান করে। এসময় শিশুকে চুমু খেলে বা শিশুর পায়খানা-প্রস্রাব স্পর্শ করার মাধ্যমে পিতা-মাতা-দাদা-দাদীও পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন, যদি তাদের শরীরে পোলিও রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি বিদ্যমান না থাকে বা তাদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে থাকে। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর রোনাল্ড ডেসরোজিয়ারের মতে, পোলিও টিকাতে আরেকটি ভয়ঙ্কর বিপদ আছে যা ভবিষ্যতে টাইম বোমার মতো বিস্ফোণের সৃষ্টি করতে পারে। আর তা হলো পোলিও টিকা তৈরীতে বানরের কিডনীর টিস্যু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে বানরদের শরীরে থাকা মারাত্মক সব ভাইরাস পোলিও টিকার মাধ্যমে মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে যা অকল্পনীয় বিপর্যয় ডেকে আনবে। ডেসরোজিয়ারের মতে, ‘আপনি হয়ত বলতে পারেন যে, ভাইরাসমুক্ত বানরের টিস্যু ব্যবহার করলেই হলো। কিন্তু সমস্যা হলো বানরের শরীরে থাকা মাত্র ২% ভাইরাস সম্পর্কে মানুষ অবহিত। কাজেই অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক ভাইরাস থেকে ক্ষতির আশংকা থেকেই যায়’। ১৯৫৯ সালে বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানির মার্ক-এর বেন সুইট নামক এক

বিজ্ঞানী পোলিও টিকাতে এসভি-৪০ নামক বানরের নতুন একটি ভাইরাস সনাক্ত করেন যেই ব্যাচের টিকা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোটি কোটি শিশুকে খাওয়ানো হয়েছিল। গবেষনায় যখন প্রমাণিত হয় যে, এসভি-৪০ একটি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এজেন্ট যা গিনিপিগের শরীরে টিউমার তৈরী করেছে; তখন সারা আমেরিকায় হৈচৈ পড়ে যায়। তারপর যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং টিকা প্রস্তুতকারী কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন থেকে পোলিও টিকা তৈরীতে অন্য প্রজাতির বানরের কোষতন্তু (tissue) ব্যবহার করা হবে।

পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে, এসভি-৪০ ভাইরাস কেবল পোলিও টিকা গ্রহনকারীদের শরীরেই নানা রকম ক্যান্সারের সৃষ্টি করে না, বরং তাদের সন্তানদের দেহেও ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সক্ষম। ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাথলজীর প্রফেসর বিজ্ঞানী জন মার্টিন সিমিয়ান সাইটোমেগালো ভাইরাস (SCMV) নামক একটি বানরের ভাইরাস নিয়ে গবেষণায় দেখেছেন যে, এটি মানুষের ব্রেনে ছোট-বড় নিউরোলজিক্যাল সমস্যার সৃষ্টি করতে সক্ষম। শিকাগোর লয়ালা ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের মলিকুলার প্যাথলজিষ্ট মিশেল কার্বন একই ধরণের টিউমার মানুষের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন যেমনটা এসভি-৪০ ভাইরাস গিনিপিগের শরীরে তৈরী করেছিল। তিনি ৬০% ফুসফুসের ক্যান্সারে এবং ৩৮% হাড়ের ক্যান্সারে

এসভি-৪০ ভাইরাসের জিন এবং প্রোটিন আবিষ্কার করেন। তিনি একটি মেডিকেল কনফারেন্সে এসভি-৪০ ভাইরাসের সাথে এসব ক্যান্সারের সম্পর্কের বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে নিশ্চিত করেন। তার সর্বশেষ গবেষণায় এসভি-৪০ ভাইরাস কিভাবে একটি কোষকে ক্যান্সারে রূপান্তরিত করে তার মেকানিজম আবিষ্কার এবং বর্ণনা করেন। মিশেল কার্বনের গবেষণায় দেখা যায় যে, এসভি-৪০ ভাইরাসটি একটি প্রোটিনকে বিকল করে দিয়ে থাকে যা কোষকে ক্যান্সারে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করে। কাজেই কারো কারো মধ্যে ব্রেন, হাড় এবং ফুসফুসে টিউমার সৃষ্টিতে এসভি-৪০ ভাইরাস একটি উপাদানরূপে কাজ করতে পারে। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা যে, পোলিও টিকা খাওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি কোন শিশু অন্য কোন ইনজেকশন নেয়, তবে তার প্যারালাইসিস এবং পোলিওমায়েলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই বিষয়টি কয়েক বছর পুর্বে ওমানে প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে পোলিও টিকা খাওয়ার পরে ডি.পি.টি. ইনজেকশন নেওয়া বিপুল সংখ্যক শিশু প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়েছিল। কেন এমনটা হয় সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কোন রহস্য কিনারা করতে পারেনি।

ইটালীর ইউনিভার্সিটি অব ফেরারা’র জেনেটিক্সের প্রফেসর মওরো টগনন গত বিশ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ব্রেন টিউমারের সংখ্যা ৩০% বৃদ্ধি পাওয়ার একটি সম্ভাব্য

কারণরূপে মনে করেন পোলিও টিকার মাধ্যমে ছড়ানো এসভি-৪০ ভাইরাসকে। আমেরিকার মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত ইটালীর এক ক্যান্সার গবেষণার ফলাফলে সুপারিশ করা হয়েছে যে, বর্তমানে তিন ধরনের ক্যান্সারের আক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হলো বানরের এসভি-৪০ ভাইরাস পোলিও টিকার মাধ্যমে মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়া ; যা বর্তমানে যৌনমিলনের মাধ্যমে পুরুষ থেকে নারীতে এবং বংশ পরস্পরায় মা থেকে গর্ভস্থ শিশুতে বিস্তার লাভ করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন, পোলিও টিকার মাধ্যমেই এইডস রোগের ভাইরাস বানরদের শরীর থেকে মানবজাতির মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব হেলথের গবেষক এবং জেনেটিক্স বিজ্ঞানী মার্ক গীয়ার বলেন যে, "সকলের সামনে টিকার ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করলে বা টিকা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের সম্পর্কে কথা বললে অন্যান্য ডাক্তাররা প্রচুর সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু একই ডাক্তাররা আবার গোপনে স্বীকার করেন যে, টিকা সম্পর্কে তুমি যা বলেছ তা ঠিক আছে। তবে এসব সবাইকে বলতে থাকলে লোকেরা ভয়ে টিকা নেওয়া বন্ধ করে দিবে"। তার মতে, চিকিৎসকদের এই ধরণের মনোভাব খুবই দুঃখজনক।

ল্যাবরেটরী এক্সপেরিমেন্ট এবং ক্লিনিক্যাল অবজারবেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন

টিকার সাথে আরো অনেক মারাত্মক মারাত্মক রোগের সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন- ডিপিটি টিকার সাথে এনাফাইলেকটিক শক (Anaphylactic shock) বা হঠাৎ মৃত্যু, এনসেফালোপ্যাথি (Encephalopathy) ব্রেনের ইনফেকশন, গুলেন বেরি সিনড্রোম (Guillain-Barré Syndrome), ডিমায়েলিনেটিং ডিজিজেজ অব সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইত্যাদি। হামের টিকার সাথে অপটিক নিউরাইটিস (Optic neuritis) দৃষ্টিশক্তির গোলমাল, মৃগীরোগ (Epilepsy), গুলেন-বেরি সিনড্রোম, ট্রান্সভার্স মায়েলাইটিস (Transverse myelitis), মৃত্যু ইত্যাদি। হেপাটাইটিস বি টিকা থেকে গুলেন-বেরি সিনড্রোম, আথ্রাইটিস (Arthritis), ডিমায়েলিনেটিং ডিজিজেজ অব সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইত্যাদি হতে পারে। সবচেয়ে বড় বিপদের কথা হলো, একই ব্যক্তি একসাথে অনেকগুলো টিকা নিলে তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়ার কারণে আমাদের কি ধরণের ক্ষতি হতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং হোমিও ডাক্তাররা শত বর্ষ পূর্ব থেকেই এসব টিকাদান কমসূচীর বিরোধিতা করে আসছেন। ব্রিটিশ সোসাইটি অব হোমিওপ্যাথ-এর দুই হাজার সদস্য রয়েছেন, যাদের কেউ টিকা সমর্থন করেন না। এমনকি যে-সব বিজ্ঞানী এসব টিকা আবিষ্কার করেছিলেন, তারাও কোন রকম মহামারী ছাড়াই বিনা প্রয়োজনে এসব টিকা পাইকারী হারে সবাইকে দেওয়ার সুপারিশ করেন নাই। কিন্তু পরবর্তীতে এটি একটি বিরাট লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। টিকার ক্ষতিকর দিক নিয়ে প্রচুর গবেষণা এবং

লেখালেখি করেছেন এমন একজন ভারতীয় গবেষক শ্রী জগন্নাথ চ্যাটার্জির মতে, “একজন মানুষের জীবনকে তছনছ/ ছাড়খার করার জন্য মাত্র একডোজ টিকাই যথেষ্ট”। (mark these words too)

যদিও দাবী করা হয়ে থাকে যে, আজ থেকে একশ বছর পূর্বে যখন পাইকারী টিকাদান কর্মসূচী শুরু করা হয়, তখন থেকেই প্রচলিত সংক্রামক ব্যাধিসমূহ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ এবং আমেরিকান তৎকালীন মেডিকেল পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ডিপথেরিয়া, যক্ষা এবং হুপিং কাশি টিকা আবিষ্কারের পূর্বেই আক্ষরিক অর্থে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, টিকার কারণে নয় বরং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীর উন্নতি, খাদ্য পুষ্টিমানের উন্নতি, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের কারণে এসব সংক্রামক ব্যাধি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের আবিষ্কৃত ঔষধ নিজেরা ব্যবহারের পূর্বে প্রথমে আমাদের মতো দরিদ্র-অশিক্ষা জর্জড়িত দেশে অল্পমূল্যে বা ক্ষেত্রবিশেষে বিনামূল্যে পাঠিয়ে দেয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। এই উদ্দেশ্যে তারা জাতিসংঘকে ব্যবহার করে তাদের ধামাধরা হিসাবে। তাদের কাছে আমরা হলাম গিনিপিগ বা গবাদিপশুতুল্য। আমাদের ওপর দশ-বিশ বছর পরীক্ষার পরে যখন নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সংশ্লিষ্ট ঔষধটির তেমন কোন মারাত্মক

ক্ষতিকর প্রভাব নেই, তখনই সেটি উন্নত দেশের লোকেরা ব্যবহার করতে শুরু করে। এই কারণে বাজারে আসা সমস্ত নতুন ঔষধ থেকে সযত্নে দুরে থাকা কর্তব্য। শ্রী রাজাজি নামক একজন ভারতীয় চিকিৎসক একটি মেয়ের ঘটনা বর্ণনা করেন, যে বিসিজি টিকা নিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং অন্য দুইজনের উল্লেখ করেছেন যারা বিসিজি নেওয়ার পরে মৃত্যুবরণ করে। আর টিকার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে গত একশ বছরের সকল গবেষণার প্রতি যদি আপনি লক্ষ্য করেন, তবে দেখতে পাবেন এদের সবচেয়ে বড় অংশটি দখল করে আছে ব্রেনের (brain) রোগসমূহ। অর্থাৎ ভ্যাকসিন থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অঙ্গটি হলো ব্রেন / মস্তিষ্ক বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম (central nervous system)। আর ব্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনি যে-সব রোগে আক্রান্ত হতে পারেন, সেগুলো হলো ব্রেন টিউমার, অটিজম (বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি), ব্রেন ড্যামেজ, মৃগীরোগ (epilepsy), মাইগ্রেন (migraine), বিষন্নতা (depression), খুন করার প্রবনতা (killing instinct), গুলেন-বেরি সিনড্রোম (Guillain barré syndrome), যৌন ক্ষমতা বিনষ্ট হওয়া (impotancy), ভাইরাস এনসেফালাইটিস (viral encephalities), অন্ধত্ব, বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ, স্মরণশক্তি নষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরেকটি সমস্যা হলো, কোটি কোটি ইউনিট টিকা উৎপাদনের সময় যান্ত্রিক

ক্রটির কারণে অনেকগুলিতে রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম এমন শক্তিশালী জীবাণু থেকে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তেমনি একটি ঘটনায় গত বৎসর ভারতের মেঘালয় প্রদেশে এগার হাজার শিশুর মৃত্যু হলে ভারত সরকার ইউনিসেফের বিরুদ্ধে আনতর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করে। ভিয়েনা ভিত্তিক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশন্যাল ভ্যাকসিন ইনফরমেশন সেন্টার' (যারা টিকার ক্ষতিকর ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষনা করে)-এর মতে, টিকা নেওয়ার কারণে শিশুদের হঠাৎ মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি দশ লাখে একটি এবং শিশুদের ব্রেন ড্যামেজের হার প্রতি ছেষট্টি হাজারে একটি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, বাস্তব সংখ্যা তার চাইতেও অনেক বেশী হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ টিকা নেওয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করা অথবা অন্য কোন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়া শিশুদের অনেক পিতা-মাতা অজ্ঞতার কারণে বিষয়টি বুঝতেও পারেন না এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগে অথবা সংবাদপত্রে রিপোর্ট করেন না (এবং দারিদ্রের কারণেও এমনটা ঘটে থাকে)। যুক্তরাষ্ট্রের অফিসিয়াল রেকর্ডে দেখা যায় যে, টিকা নেওয়ার কারণে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি শিশুর মৃত্যু হয়ে থাকে এবং ডাক্তাররা স্বীকার করেছেন যে, টিকার মাধ্যমে সিফিলিস রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া টিকা দেওয়ার পরে অনেক শিশুই প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং এসব পরিস্থিতিতে পিতা-মাতার অবহেলায় শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা হরহামেশা প্রত্রিকায় দেখা যায়। হ্যাঁ, ক্রটিযুক্ত টিকা বা টিকা প্রয়োগজনিত ক্রটির কারণে আপনার প্রাণপ্রিয় সন্তান চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে

যেতে পারে। অজ্ঞতার কারণে এক সময় অনেক দেশেই টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে সে অবস্থা এখন আর নেই। কাজেই বর্তমানে অভিবাবকদের উচিত প্রতিটি বিষয়ের ভাল-মন্দ জেনে-শুনে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া। শিশুদের পাইকারী হারে টিকা দেওয়ার এই রমরমা অবস্থার পেছনের কারণ সম্পূর্ণই বাণিজ্য অর্থাৎ মালের ধান্ধা। যে-সব দেশে এসব টিকা তৈরী হয়, সে-সব দেশের সরকারসমূহ প্রতি বছর এসব টিকা কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ট্যাক্স পেয়ে থাকে।

ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা টিকার বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক নিয়ে হৈচৈ করলেও ডলারের লোভে সরকারগুলো টিকা কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না। এসব টিকা কোম্পানীগুলো রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, শিশু বিশেষজ্ঞ, সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের আমলাদের নানা রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে হাত করে থাকে। সরকারী ডাক্তাররা অনেক ক্ষেত্রে এসব পাইকারী টিকাদান কর্মসূচীতে আগ্রহী না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের চাপে বাধ্য হয়ে করতে হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পাইকারী টিকা কর্মসূচীর মাধ্যমে অজ্ঞ জনসাধারণকে বুঝানোর চেষ্টা করে যে, তাদের দল জনগণের কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-তদ্বির করে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার

এবং আমলারা টিকা কোম্পানীর কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে সেখানে শিশুদের টিকা নেওয়া বাধ্যতামুলক করে আইন পাশ করিয়েছে। তারপরও সেখানে অনেকে আদালতের অনুমতি নিয়ে নিজেদের শিশুদের টিকা থেকে দুরে রাখেন। যেহেতু টিকা তৈরীতে বানর, শুকর, ইদুর, গিনিপিগ ইত্যাদি প্রাণীর রক্ত, মাংস ব্যবহৃত হয়, এজন্য অনেক বিজ্ঞ আলেম মুসলমানদের জন্য টিকা নেওয়া হারাম ঘোষণা করে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। টিকা কোম্পানির কাছ থেকে আমেরিকান শিশু বিশেষজ্ঞরা যে বিপুল পরিমান কমিশন পান, তার লোভে জোর করে শিশুদের টিকা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং টিকা না নেওয়া শিশুরা কোন রোগে আক্রান্ত হলে তাদেরকে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। এজন্য শিশুদের সাথে এবং তাদের অভিভাবকদের সাথে বর্বর আচরণ করতেও দ্বিধা করেন না। ফলে বিবেকবান লোকেরা এটিকে চিকিৎসার নামে স্বৈরতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেন। এই কারণে ঐসব শিশুরা সেখানকার হোমিওপ্যাথিক, ন্যাচারোপ্যাথিক, ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসকদের অধীনে চিকিৎসা নিয়ে বেশ ভালই থাকেন। টিকা কোম্পানি এবং তাদের দালালদের এসব অমানবিক আচরণ ইদানীং সেখানে অনেক কমে এসেছে। কারণ ইদানীং টিকা নিয়ে মৃত্যুবরণ করা অথবা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়া শিশুদের পিতা-মাতারা ফটাফট আদালতে মামলা ঠুকে দেন এবং আদালতও ঝটপট টিকা কোম্পানির কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা জরিমানা আদায় করে দেন।

লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের টিকা আবিস্কারেরও পঞ্চাশ বছর আগে আমেরিকান হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ কন্সট্যান্টাইন হেরিং জলাতঙ্ক (Hydrophobia/Rabies) রোগের ভাইরাস থেকে জলাতঙ্কনাশী ঔষধ হাইড্রোফোবিনাম (Hydrophobinum/ Lyssinum) তৈরী করে জলাতঙ্ক চিকিৎসায় সফলতার সাথে ব্যবহার করেছেন। বিজ্ঞানী কচ যক্ষ্মার টিকা আবিষ্কারেরও চার বছর পূর্বে ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ বার্নেট যক্ষ্মার জীবাণু থেকে ব্যাসিলিনাম (Bacillinum) নামক ঔষধ তৈরী করেছেন যা শতবর্ষ পরেও অদ্যাবধি যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি তৈরীতে সরাসরি রোগের জীবিত জীবাণু ব্যবহৃত হয় না, বরং ক্রমাগত ঘর্ষণের মাধ্যমে জীবাণুকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয় এবং খুবই সূক্ষ্মমাত্রায় শক্তিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই কারণে রোগ প্রতিরোধে এগুলো খুবই কার্যকর এবং এদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাই বললেই চলে। তাছাড়া এগুলো মুখে খেলেই চলে; ইনজেকশনের মতো নিষ্ঠুরতাও এতে নেই। তাই রোগ প্রতিরোধ বা টিকা নেওয়ার কথা চিন্তা করলে আমাদের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ওপরই নির্ভর করা উচিত।

নোবেল বিজয়ী অস্ট্রিয়ার হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী জর্জ ভিথুলক্কাস মনে করেন, টিকা প্রথা ঔষধের প্রতি ব্যক্তির সংবেদনশীলতা বা সাসসেপটিবিলিটি

নীতিকে লংঘন করে, এটি হোমিওপ্যাথির মূলনীতি বিরোধী এবং সমগ্র মানবজাতির স্বাস্থ্যকে অবনতির দিকে নিয়ে যায়। টিকা হলো নিষ্পাপ এবং অসহায় শিশুদের উপর একটি পৈশাচিক বর্বরতা। যেহেতু আমরা কেউ জানি না, আল্লাহ্ কোন শিশুর ভাগ্যে যক্ষা-ডিপথেরিয়া লিখে রেখেছেন আর কোন শিশুর ভাগ্যে হুপিং কাশি-ধনুষ্টঙ্কার নির্ধারিত করে রেখেছেন; সেহেতু আন্দাজে আট-দশটি মারাত্মক রোগের জীবিত জীবাণু শিশুর অনুমতি ছাড়াই জোরপূর্বক তার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়াকে একেবারেই অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। টিকা নিলে শিশুর কোন না কোন ক্ষতি হবেই; হতে পারে তা ছোট কিংবা বড়। আবার টিকা নেওয়ার ক্ষতিটা প্রকাশ পেতে পারে কয়েক মিনিট, কয়েক ঘণ্টা, কয়েক দিন, কয়েক মাস, কয়েক বছর এমনকি কয়েক যুগ পরে। অনেক জ্ঞানীব্যক্তি মনে করেন যে, শিশুদের রোগ মাত্রই মারাত্মক রোগ এমনটা ধারণা করা সঠিক নয়। তারা বিস্মিত হন এই ভেবে যে, শিশুদের ইমিউনিটি (Immunity) গঠনের জন্য এত কিছু করতে হবে কেন ? বুকের দুধ এবং স্বাভাবিক খাবারই তাদের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ শক্তি গঠনের জন্য যথেষ্ট। অনেক পিতা-মাতা প্রথমবার টিকা নেওয়ার পর শিশুর ওপর তাদের ক্ষতিকর ক্রিয়া লক্ষ্য করে ডাক্তারদের বললে (না জানার কারণে বা টিকার বদনাম হবে মনে করে) ডাক্তাররা সেটি টিকার কারণে হয়েছে বলে স্বীকার করেন না। ফলে ডাক্তারদের আশ্বাসে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার টিকা নেওয়ার ফলে দেখা যায় শিশুর এমন মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়, যার আর কোন প্রতিকার

করা যায় না।

যদিও বলা হয়ে থাকে যে, টিকা না নেওয়া শিশুরা টিকা নেওয়া শিশুদের জন্য বিপজ্জনক। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, টিকা নেওয়া শিশুরাই বরং অন্য শিশু এবং বয়ষ্ক লোকদের জন্য বিপজ্জনক। কেননা সম্প্রতি টিকা নেওয়া শিশুরা সে-সব রোগের জীবাণু তাদের শরীরে বহন করে থাকে, তাদের সংস্পর্শে এসে অন্য শিশুরা এবং বয়ষ্ক লোকেরা সে-সব রোগের আক্রান্ত হতে পারেন, বিশেষত যাদের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল। আর এভাবেই 'তথাকথিত' অনেক মহামারী রোগের সৃষ্টি এবং বিস্তার করেছে টিকা নেওয়া শিশুরা ; যদিও এজন্য দায়ী করা হয় টিকা না নেওয়া শিশুদেরকে। অন্যদিকে ঠিক একই প্রক্রিয়ায় টিকা না নেওয়া শিশুরা টিকা নেওয়া শিশুদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রোগের ইমিউনিটি লাভ করে থাকে। টিকার সমর্থকরা মনে করে থাকেন, এভাবে সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্তভাবে টিকা না নেওয়া শিশুরা উপকৃত হয়ে থাকেন। এটা একটি অদ্ভূত যুক্তি কেননা তারা একই সাথে বলে থাকেন যে, শিশুকে টিকা না দিয়ে তাদেরকে অতিমাত্রায় ঝুঁকির মধ্যে ফেলে রেখে সংশ্লিষ্ট পিতামাতা একটি দ্বায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করে থাকেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী পোলিও টিকা নেওয়া শিশুদের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর অন্তত দশ ব্যক্তি পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে চিরতরে পঙ্গু

হয়ে থাকে। টিকার ব্যবসায়ের সবচেয়ে শয়তানী দিক হলো, এগুলো কিভাবে তৈরী করা হয় তা টিকা কোম্পানিগুলো বিস্তারিত প্রকাশ করে না। একচেটিয়া মাল কামানোর সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে ভেবে তারা এই গোপনীয়তা অবলম্বন করে। অথচ এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদিকসহ পৃথিবীর সকল ঔষধেরই উৎপাদন প্রক্রিয়াতে কোন গোপনীয়তা নেই; এগুলো সবই একটি প্রকাশ্য বিষয়, সবার জন্য উন্মুক্ত।

ন্যাচারোপ্যাথিক ডাক্তারদের মধ্যে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ ন্যাচারোপ্যাথিক চিকিৎসক (Naturopathic Doctors) পাইকারী টিকা কর্মসূচীকে মনে করেন প্রাকৃতিক নীতিবিরুদ্ধ, অপ্রয়োজনীয় এবং বড়লোকী কারবার। ন্যাচারোপ্যাথিক চিকিৎসকদের এসোসিয়েশনের এক সাধারণ সভায় যে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে, তাতে সুপারিশ করা হয়েছে যে, টিকা খুবই ক্ষতিকর এবং অদরকারী একটি বিষয় ; সুতরাং এসব বর্জনের জন্য শিশুদের পিতামাতাকে উৎসাহ দিতে হবে। শিশুদের অস্বাভাবিক সামাজিক আচরণ বা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিত্ব অর্থাৎ অটিজমের একটি মূল কারণ যে এই টিকা, এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণ সম্বলিত মোটামোটা বই-পুস্তক ইউরোপ-আমেরিকার বইয়ের দোকানগুলোতে দেখতে পাবেন। মেনিনগোকক্কাল মেনিনজাইটিসের টিকা নেওয়ার পরে যখন খবর পাওয়া গেলো যে, অনেক

লোক গুলেন-বেরি সিনড্রোমে (Guillain Barrĕ Syndrome) আক্রান্ত হয়ে প্যারালাইসিস বা মৃত্যুর শিকার হচ্ছে, তখন ফ্রান্স সরকার সেটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। টিকার ক্ষতিকর দিক নিয়ে আজ পযর্ন্ত যত গবেষণা হয়েছে, সেগুলো বিস্তারিত অধ্যয়ন করলে যে কারো এমন ধারণা হতে পারে যে, আধুনিক যুগে মানুষ এবং গৃহপালিত পশু-পাখিদের যত রোগ হয়, তার শতকরা নিরানব্বই ভাগ রোগই বুঝি এই টিকার কারণেই হয়। হ্যাঁ, সত্যি তাই ; এমন মনে হওয়াটা মিথ্যে নয়। সম্প্রতি ল্যানসেট (Lancet) নামক একটি বিখ্যাত মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে দাবী করা হয়েছে যে, তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলো জাতিসংঘের কাছ থেকে বেশী বেশী আর্থিক সাহায্যের আশায় তাদের দেশের শিশুদের বেশী বেশী টিকা নেওয়ার মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকে। সারকথা হলো, রোগমুক্ত থাকার জন্য যে-সব শর্ত আমাদের মেনে চলা উচিত তা হলো- পুষ্টিকর খাবার গ্রহন করা, পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা এবং শরীরের জন্য ক্ষতিকর বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকা। অন্যথায় আপনি হাজার বার টিকা নিয়েও রোগের হাত থেকে নিস্তার পাবেন না। আসুন আমরা সবকিছু সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি এবং এভাবে নিজেদেরকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করি।

পোলিও টিকা সহ সাধারণ যেসব টিকা বাচ্চাদেরকে দেয়া হয়, এগুলির প্রত্যেকটি মারাত্মক রকমের ক্ষতিকর, যদিও ক্ষতির পরিমাণ সব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এক রকম হয়না। কোন কোন বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রভাবটা সাথে সাথে হয়(Autism)(১)। কোন কোন বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রভাবটা সাথে সাথে না হলেও তার শৈশবেই হয় (childhood diabetes, cancer, leukemia).(২)

বর্তমানে যে পোলিও টিকা ব্যবহৃত হয়, এর নাম "IPOL®"। এর লাইসেন্স যুক্তরাষ্ট্রে করা, SANOFI কোম্পানির মালিকানাধীনে। (আরেকটি পোলিও টিকা Polivax এর ব্যাবহার অনেক আগেই (১৯৯১) বন্ধ করা হয়েছে) IPOL® টিকাতে মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় বানরের কিডনি, এবং এর পাশাপাশি Formaldehyde, বা Formalin ও থাকে। (৩)

এগুলি কোন ষড়যন্ত্র তত্ব নয়, সন্দেহ হলে আপনি নিজেই দেখে নিতে পারেন এগুলি Wikipedia তে এবং CDC এর website এ বিস্তারিত দেয়া আছে।
> Wikipedia তে প্রকাশিত বিভিন্ন টিকা ও সেগুলির উপাদান সমূহঃ (৪)

> CDC এর website এ প্রকাশিত বিভিন্ন টিকা ও সেগুলির উপাদান সমূহঃ (৫)

(CDC, Centers for Disease Control and Prevention হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক সরকারী সংস্থা।)

Formaldehyde(Formalin) এবং Thimerosal(Mercury), এই দুটি ভয়ঙ্কর কেমিক্যাল প্রায় সবগুলি ভ্যাকসিনেই উপস্থিত আছে।
খাবার ফরমালিন মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমরা খুবই সচেতন, কিন্তু আমাদের নাজুক বাচ্চাদের শরীরে যে সরাসরি Formalin ঢুকানো হয়, সে ব্যাপারে আমরা অনেকেই অবগত নই।
তাদের ভাষ্য মতে এগুলি সহনীয় মাত্রায় আছে, সুতরাং এগুলি নিরাপদ। তাদের এই যুক্তি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়।(৬),(৭)

তারা আরও বলে থাকে যে ছোটবেলায় বাচ্চাদের শরীরে এসব প্রবেশ করালে তাদের ইমিউন সিস্টেম এগুলকে প্রতিরোধ করতে তৎপর হবে, এবং কিছু কিছু কেমিকেল যেমন Formaldehyde নাকি শরীরের ব্যাকটেরিয়া অকার্যকর করে দেয়। শুধুমাত্র ধারণার ভিত্তিতে সুনিশ্চিত ক্ষতিকর জিনিস একটা সুস্থ সবল শরীরে প্রবেশ করানো কতটুকু যুক্তিযত?

এখানে হারাম-হালালেরও একটা ব্যাপার আছে। শরীরের জন্য ক্ষতিকর যেকোনো কিছুই হারাম।

IPOL® ছাড়াও RotaTeq®, ACAM2000®, Kinrix® এবং Pediarix® নামের টিকাগুলিতে উপাদান হিসেবে বানরের কিডনি ব্যবহৃত হয়। কুকুরের কিডনি ব্যাবহার করা হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার একটি ভ্যাকসিন FLUCELVAX® এ। শুওরের রক্ত ব্যবহৃত হয় FLUMIST®, এবং ZOSTAVAX® এ।

অনেকেই বলবে যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে হারাম জায়েজ হয়ে যায়। হারাম জায়েজ হয়ে যায় ঠিক, কিন্তু সেটা শুধু নিশ্চিত মৃত্যু, অথবা বড় কোন রোগ, যেটাতে ইতিমধ্যে কেউ আক্রান্ত, সেখান থেকে তাকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে। একটা সুস্থ সবল শিশুর শরীরে বিনা কারণে এভাবে Formalin বা যেকোনো কেমিক্যাল ঢুকানো জায়েজ তো নয়ই, বৈজ্ঞানিক ভাবেও সমর্থিত নয়।

এসবের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সহ উন্নত দেশগুলোর উঁচু পর্যায়ের অসংখ্য ডাক্তার

এবং গবেষকগণ সোচ্চার হয়েছেন, এবং এ ব্যাপারে তাদের লেখা অনেক বই ছাপানো হয়েছে, এবং ডকুমেন্টারি বানানো হয়েছে। বইয়ের এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বই -

Vaccine Villains(৮)

Thimerosal: Let the Science Speak(৯)

(এই দুটি বই যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট John F. Kennedy এর ছেলে Robert F. Kennedy Jr. এর লেখা)

Vaccines on trial(১০), Vaccine epidemic(১১), How to end the autism epidemic(১২), Evidence of Harm(১৩)

ডকুমেন্টারির মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

"A shot in the dark"

https://youtu.be/B2N35yVQcSk

লিঙ্কসমূহঃ

(১) https://www.globalresearch.ca/uncovering-the-cover-up-scientific-analysis-of-the-vaccine-autism-connection-deeply-flawed-vaccine-policies/5491987

(২)https://www.globalresearch.ca/new-study-in-journal-of-public-health-finds-autism-and-cancer-related-to-human-fetal-dna-in-vaccines/5402912

(৩) https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/ipol-poliovirus-vaccine-inactivated-monkey-kidney-cell

(৪) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vaccine_ingredients

(৫)
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf

(৬) https://www.globalresearch.ca/mercury-and-vaccines/5571134

(৭) https://www.globalresearch.ca/cdc-caught-hiding-data-

showing-mercury-in-vaccines-linked-to-autism/5430305

(৮) https://www.amazon.com/Vaccine-Villains-American-Public-Industry/dp/1510711619

(৯)https://www.amazon.com/Thimerosal-Evidence-Supporting-Immediate-Neurotoxin/dp/1634504429

(১০) https://www.amazon.com/Vaccines-Trial-Truths-Consequences-Mandatory-ebook/dp/B077NX99G9

(১১) https://www.amazon.com/Vaccine-Epidemic-Corporate-Coercive-Government/dp/1620872129

(১২) https://www.amazon.com/How-Autism-Epidemic-J-B-Handley/dp/1603588248

(১৩) https://www.amazon.com/Evidence-Harm-David-Kirby/dp/B001SWNUPQ

নিচে দেয়া এসব লিংকে গিয়ে জানুন টিকার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবেঃ-

http://www.thinktwice.com

http://www.909shot.com

http://www.vaclib.org

http://www.novaccine.com

http://www.vaproject.org

http://www.jabs.org

http://www.vacinfo.org

বাংলাদেশি ডাক্তারদের মধ্যে প্রথম টিকা বা ভ্যাকসিনের গোমর ফাঁস করলেন ডাঃ মুজিবুর রহমান (এম.ডি, কার্ডিওলজিস্ট, ফাউন্ডার ভেন্টেজ ন্যাচারাল হেলথ সেন্টার।)

সম্পুর্নটা দেখুন সবাই - main link :

https://youtu.be/0AGH6jhljT4

ফেসবুক থেকে দেখতেঃ (shareable link)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=226913002355513&id=104748297905318

আলহামদুলিল্লাহ, সত্য উপলব্ধি তে সক্ষম বান্দারা এতক্ষণে টিকার অসারতা সম্পর্কে বুঝে গেছেন ইনশাআল্লাহ। এবার আসা যাক করণীয় কি সে আলোচনায়ঃ

●টিকা না নেয়ার উপকার:

অনেকেই ভয়ে আছেন টীকা না দিলে কোনো ক্ষতি হবে কিনা? ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। মিডিয়া আমাদের ব্রেন ওয়াশড করে দিচ্ছে। যেমন এখন করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে সবাইকে আতংকিত করে রেখেছে। তাই আমরা মনে করি বাচ্চাকে টিকা না দিলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে। ভুল । একদম ভুল চিন্তা ধারা। বরং টিকা দিলেই আপনার বাচ্চার শরীরে আরো অনেকগুলো রোগের জীবাণু প্রবেশ করবে। আর টিকা না দিলে বাচ্চার কোনো ক্ষতি হবে না ইংশাআল্লাহ। বরং আপনার বাচ্চা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ, সবল, মেধাবী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকবে। দেখবেন টিকা নেয়া বাচ্চা গুলোর রোগ লেগেই থাকে।
এটা স্পষ্ট একটা ষড়যন্ত্র। তারা মুসলিম উম্মাহকে পঙ্গু করে দিতে চায়। বিল গেটস সহ এলিটরা কেউই এসব টিকা নেয় না।
যারা টিকা বানায় - তারা নিজেরা ও নিজ পরিবারকে কখনোই টিকা নেয়ায় না। এ ব্যাপারে অনেক দলিল আছে অনলাইনে । এটা তো একটা কমন সেন্স আপনার এখন কোনো জ্বর বা কোনো অসুখ নেই। অথচ আপনি জ্বর আসতে পারে(যদিও কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যায় নি) এ ভয়ে এখনই জ্বরের বা ডায়রিয়ার ঔষধ খেয়ে বসে আছেন। আপনার বাচ্চাকে আল্লাহ তাআলাই সমস্ত

রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা দিয়েই পাঠিয়েছেন। টুকটাক ছোটোখাটো অসুখ গুলো আল্লাহর ইচ্ছায় প্রাকৃতিক ভাবেই সেড়ে যায়। কথায় কথায় ডাক্তার আর ঔষধের দিকে দৌড়ানোর অভ্যাস ভালো না।আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রাথমিক সুন্নাহ চিকিৎসা (মধু, কালিজিরা তুলসী পাতা ইত্যাদি) নেয়ার অভ্যাস করুন। এক্ষেত্রে তিব্বে নববী কিতাবটা অনুসরণ করতে পারেন।

●টিকা না নিলে সমস্যা সমূহঃ

আপনার বাচ্চাকে টীকা না দিলে সর্বপ্রথম আপনার নিজের পরিবার ও আত্মীয় স্বজন থেকেই বাধাগ্রস্ত হবেন। তারা আপনাকে বিভিন্নভাবে পেরেশান করবে। কম বেশি সবাই আপনাকে কথা শুনাবে। এক্ষেত্রে আপনার ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল থাকতে হবে। নয়ত টিকতে পারবেন না।

এরপর আরও সমস্যায় পরবেন ডাক্তার দেখাতে ও জন্ম সনদ বানাতে গিয়ে। টীকা কার্ড ছাড়া ডাক্তার আপনার বাচ্চাকে দেখতে চাবে না। আবার জন্ম সনদও দিবেনা। এক্ষেত্রে আপনাকে স্বাস্থ্য কর্মীর সাথে বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে একটা ফেক টীকা কার্ড বানিয়ে রাখতে হবে। ব্যাস, কোনোরকমে ৩/৪ বছর পার করতে পারলে আর কোন সমস্যা হবে না ইংশাআল্লাহ। তবে বারবার বলি ইমান মজবুত না হলে আপনি এ যুদ্ধে টিকতে পারবেন না।

হামেলা মা দেরকে যে টীকা দেয়া হয়, সেটাও নিস্প্রয়জন। ওটা থেকেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করবেন। ঘরে নরমাল ডেলিভারি করানোর চেষ্টা করবেন।

হামেলা (প্রেগন্যান্ট) অবস্থায় তালিম, তেলয়াত, জিকির, পর্দা ও স্বাস্থ্যসম্মত (বিশেষ করে খেজুর) খাবার খাবে। জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলবে। টিভি, মিউজিক, গিবত থেকে ১০০ হাত দূরে থাকবে। তাহলে, আল্লাহ্‌ সব কিছুকে সহজ করে দিবেন।

আমরা জানি যে এই ভ্যাকসিন নিতে মানুষকে বাধ্য করা হবে। রীতিমতো শুরুও হয়ে গেছে। সরকারি ভাবেই ফোর্স করা হবে। চাকুরীজীবি সবাইকেই নিতে বাধ্য করা হবে। অনেক প্রাইভেট কোম্পানি তো নিজেদের স্টাফদের জন্য নিজ উদ্যোগে আগেই নিয়ে আসা শুরু করেছে এবং স্টাফদের জন্য ১২০০ - ১৫০০ টাকা করে প্রতি ডোজের মূল্য নির্ধারণ করেছে। আবার যারা বিদেশে থাকে, তাদেরকে নিতেই হবে। কোনো উপায় নেই।

এখন, যেমন NID কার্ড ছাড়া আপনি কোনো নাগরিক সুবিধা পাবেন না। ঠিক তেমনি ওই ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট না থাকলে আপনি বিভিন্ন জায়গায় হয়রানি হবেন। এভাবেই সিস্টেমকে সাজানো হয়েছে।

আবার, এখন লকডাউনে "No mask, No service" চলছে, তেমনি সামনের দিনগুলোতে আসবে "No vaccine, No service".

তাহলে এক্ষেত্রে কি করণীয়?

●সমাধানঃ

সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে , একটা নকল টিকা সার্টিফিকেট বানিয়ে নেয়া। সেটা দিয়েই কোনো রকমে বর্তমান পরিস্থিতিটাকে পার করা। আর যাদেরকে টিকা নিতেই হবে, তারা নিচের আমলগুলো অনুসরণ করবেন।

যারা প্রানপণে চেষ্টা করছেন মিথ্যা করোনার বিধ্বংসী ভ্যাকসিন থেকে বাচার জন্য তারা চেষ্টা জারি রাখবেন। এই চেষ্টায় যখন একদম নিরুপায় হয়ে যাবেন এই ভ্যাকসিন নিতে তখন যা যা করবেনঃ-

১) করোনা ভ্যাকসিন নেয়ার আগে ৭ টা আজওয়া খেজুর খাবেন।

২) দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দুয়া করবেন যেন ভ্যাকসিন এর কার্যকরীতা আল্লাহ্ পানির কার্যকারিতায় বদলে দেয়।

৩) ভ্যাকসিন নেয়ার সময় পুরোপুরি মনকে আল্লাহর স্মরণে ডুবে রাখবেন আর পড়বেন,
"আউযুবি কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররীমা খলাক্ব "।
আল্লাহ চায় তো এই ভ্যাকসিন আপনার দেহে অসাড় হয়ে পড়বে।

মনে রাখবেন একদম নিরুপায় না হলে এই ভ্যাকসিন নিবেন না, এই ভ্যাকসিন আপনাকে জোম্বি হতে সাহায্য করবে আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে মাকাল ফল করে দিবে, তাই সাবধান।

●আজোয়া খেজুরের উপকারিতা::
■"*সা‘দ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেকদিন সকালবেলায় সাতটি আজওয়া উৎকৃষ্ট খেজুর খাবে, সেদিন কোন বিষ ও যাদু তার ক্ষতি করবে না।" [সহীহ বুখারী (তাওহীদ) ৫৪৪৫/হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)]*

■"*ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, ইবনু আয়্যুব ও ইবনু হুজর (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মদিনার আলিয়া অঞ্চলের (উঁচু ভূমির) আজওয়া খেজুরে শেফা (রোগমুক্তি)*

রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেনঃ প্রতিদিন সকালের এর আহার বিষনাশক (ঔষধের কাজ করে)।"
[সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) ৫১৬৮/হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)]

■*"আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল-আলিয়ার আজওয়া খেজুর খেয়েই সকালের উপবাস প্রথমে ভাঙলে তা (সর্বপ্রকার) যাদু অথবা বিষক্রিয়ার আরোগ্য হিসেবে কাজ করে।"*
[মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ২৩৫৯২]

৭ টি আজোয়া খেজুর যেহেতু বিষ ও জাদুকে কাটিয়ে দিতে পারে, সুতরাং টিকার জাদুকরী কার্যকারিতাও কাটিয়ে দিতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

●শেষ কথাঃ করোনা ভাইরাস কে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মিডিয়ার দ্বারা ছড়ানো হয়েছে যাতে করে মুসলমানদের শরীরে এসব বিষ (ভ্যাক্সিন) প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দুর্বল করিয়ে দেয়া যায় যেন আসন্ন দিনগুলোর জন্য প্রস্তুত হতে না পারি আমরা ।

আমি মোটেও এ কথা বলছিনা যে, আপনারা একেবারে ডাক্তার দেখানো বা চিকিৎসা নেয়া ছেড়ে দেন। বলতে চেয়েছি টীকার মত ষড়যন্ত্র গুলোকে বুঝতে

শিখুন এবং এই ফাদ থেকে বেঁচে থাকুন। এবার সিদ্ধান্ত আপনার। আপনি কনফিউসনে থাকলে এস্তেখারা নামাজ পরে নিতে পারেন।

আল্লাহ্ আপনি আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাজত করুন, আমিন।
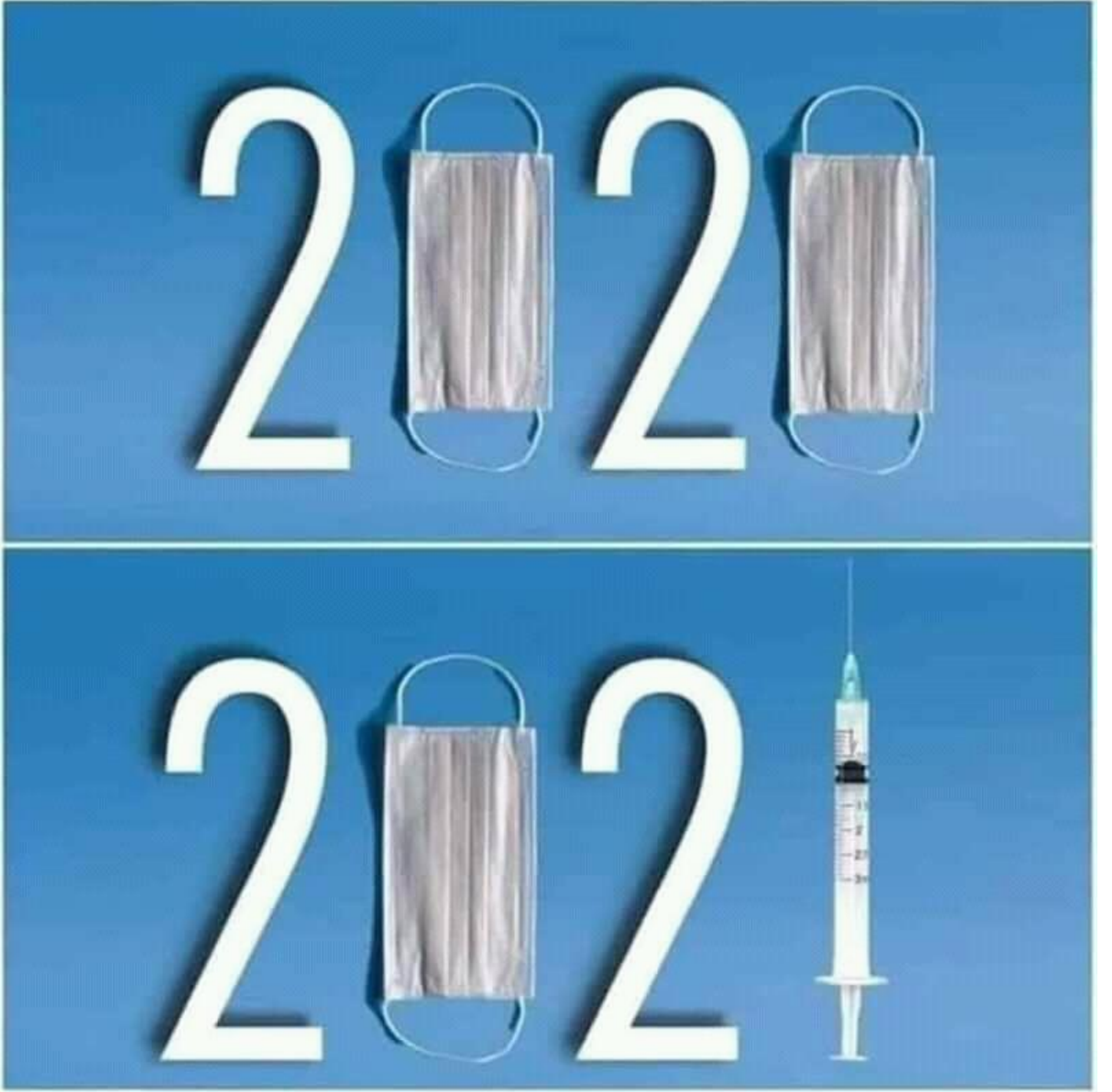
তা-ই কি হচ্ছে না?

ঠান্ডা মাথায় খুব গভীর ভাবে ভাবুন,

এসব হচ্ছে এবং হবে, সামনে আরো ভয়াবহভাবে

কীভাবে মোকাবিলা করবেন যদি অস্বীকার করে বসে থাকেন?

পর্ব ৬

অর্থনীতির পতনঃ মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তন - ডিজিটাল কারেন্সি
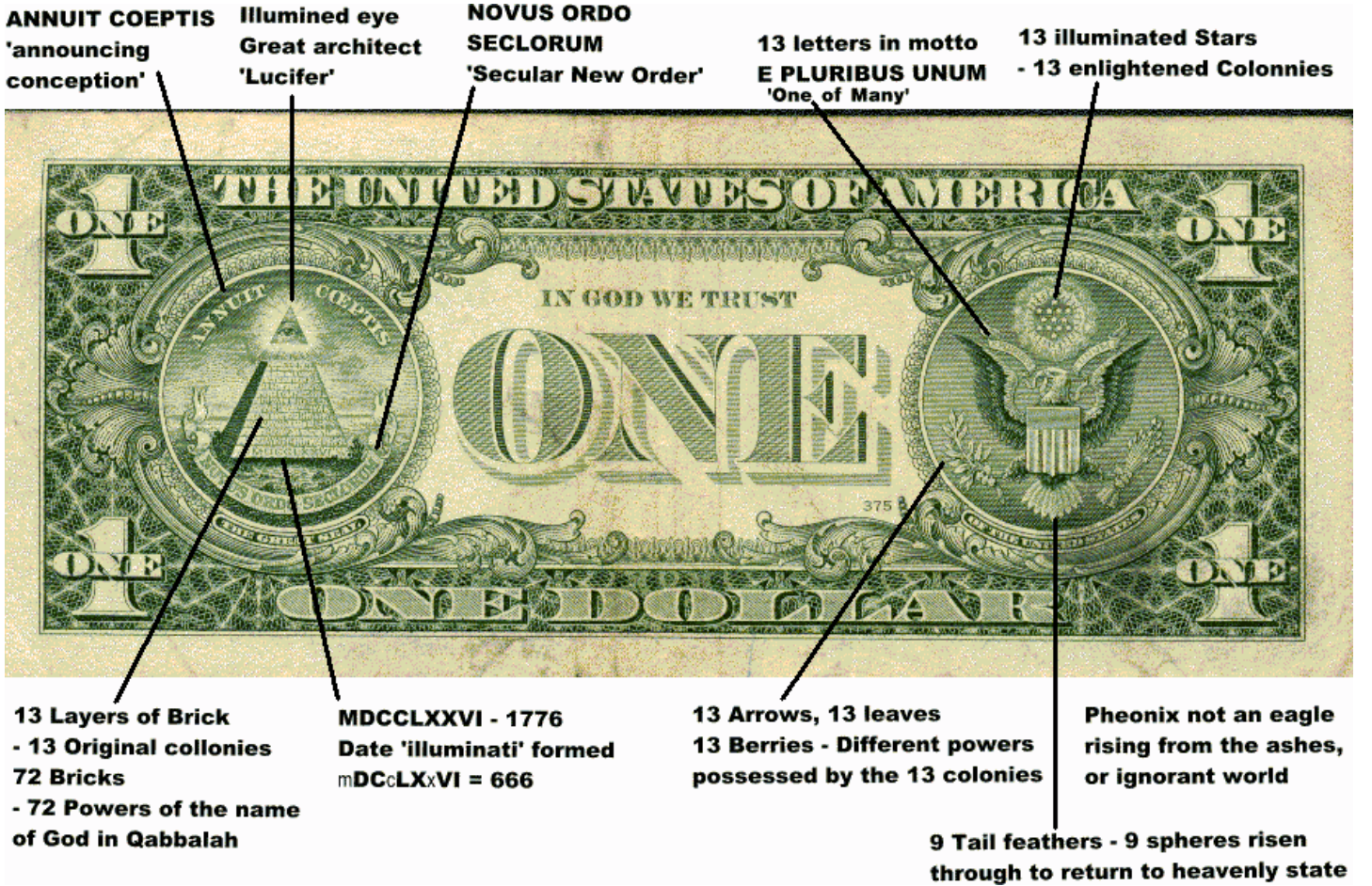
- ### কাগুজে মুদ্রা বা জাল টাকা:

কাগুজে মুদ্রা আর স্বর্ণ মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য হলো কাগুজে মুদ্রা চাইলেই ছাপানো

যায়। কিন্তু স্বর্ণ মূদ্রা চাইলেই ছাপানো যায় নাহ। কারণ এটি অতি দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদ। আর কাগুজে মূদ্রা কে মনোপলির কাগজের খেলনার টাকার সাথে তুলনা করতে পারেন। সরকার রুল জারি করেছে তাই এই কাগুজে মূদ্রা গ্রহণ করতে সবাই বাধ্য। কিন্তু স্বর্ণ মূদ্রার ক্ষেত্রে এই রকম কোনো রুল জারি করতে হয় নাহ। কারণ স্বর্ণ অনেক আগে থেকেই অতি দুর্লভ একটি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সবার নিকট গ্রহনযোগ্য। বর্তমান টাকাকে (লিগেল টাকা, কারণ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত) জাল টাকার (ইলিগেল টাকা কারণ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নাহ) সাথে তুলনা করতে পারেন। অনেকটা লিগেল প্রষ্টিটিউশান ও ইলিগেল প্রষ্টিটিউশান এর মতন। সরকার কতৃক স্বীকৃত, তাই এটি লিগেল প্রষ্টিটিউশান। আর সরকার কতৃক অস্বীকৃত, তাই এটি ইলিগেল প্রষ্টিটিউশান। কিন্তু প্রষ্টিটিউশান এর কাজ একই। এই কাগুজে টাকার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

১৭০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে রশিদ (এই রশিদ কে বর্তমান এ চেকের সাথে তুলনা করতে পারেন) হিসেবে প্রথম কাগজের মূদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বাজারে ব্যাপকহারে চালু হয়ে যায়। কারণ তখন বিশাল স্বর্ণ মুদ্রার স্তুপ নিজের ঘরে রাখা নিরাপদ ছিল নাহ। মানুষ তখন স্বর্ণকার ও মহাজনদের নিকট আমানতস্বরূপ স্বর্ণ রাখা শুরু করে। স্বর্ণকাররা তাদের নিকট স্বর্ণ -রূপা মুদ্রা আমানত রাখার সময় প্রমাণ স্বরূপ একটা কাগুজে রশিদ বা রিসিপ্ট দিয়ে দিত। পরবর্তীতে রশিদগুলোকে সংস্কার সাধন করে একটি নির্দিষ্ট আকৃতির অধীনে

নিয়ে আসা হয়। আর একেই বলা হয়, 'ব্যাংক নোট'। আর স্বর্ণকার ও মহাজন রা এই আমানত কৃত স্বর্ণ জনগণের নিকট সুদের উপরে ঋণ দিয়ে তাদের ব্যবসা চালাতো। যেমন: যে স্বর্ণ জমা দেয়, তাকে সুদ হিসবে একটি স্বর্ণ দেওয়া হতো আর যে ঋণ নিতো সে সুদ হিসেবে মহাজন বা ব্যাংক কে দুইটি স্বর্ণ দিতো (প্রতি ১০ স্বর্ণে)। আর মাঝখানে এই একটি স্বর্ণ মহাজনের লাভ। এইভাবেই তারা ব্যাংকের ব্যবসা করতো।

তখনকার সময় কাগুজে নোটের বিপরীতে ব্যাংকে শতকরা একশত ভাগ মূল্যমানের সোনা সংরক্ষিত থাকতো। ব্যাংক বাধ্যতামুলকভাবে যে পরিমাণ সোনা তার কাছে মওজুদ থাকতো ,ঠিক সেই পরিমাণেই কাগুজে নোট বাজারে চালু করতো। নোট ব্যবহারকারী যে কোন সময় ব্যাংক থেকে এই নোটের পরিবর্তে সোনা অর্জন করার অধিকার থাকতো। যখন এই ব্যবস্থা ছিলো, তখনও কোনো ধরনের সমস্যা ছিলো নাহ।

এরপর ১৮৩৩ সালে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাগুজে নোটের আইনগত ভ্যালু প্রদান করা হয়। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে তা গ্রহণ করতে জনগণকে বাধ্য করা হয়। সরকার যখন বাধ্য করল,জনগণও তা গ্রহণ করল। তখন সরকার পক্ষ নোটের বিপরীতে স্বর্ণ মওজুদ রাখার ব্যাপারে শিথিলতা শুরু করল। একটা সময় রাষ্ট্রপক্ষ স্বর্ণের মওজুদের অতিরিক্ত কাগুজে নোট ছাপানো শুরু করল।

অতিরিক্ত কাগুজে নোট ছাপানোর ফলে কাগজের নোটের সাথে স্বর্ণ মূদ্রার দামের যে ভারসাম্য ছিলো তা আস্তে আস্তে নষ্ট হতে শুরু করে। আগে ১ টি ব্যাংক নোট দিয়ে একটি স্বর্ণ মূদ্রা দিতো সরকার বা মহাজন। কিন্তু অতিরিক্ত কাগুজে নোট ছাপানোর ফলে বাজারে ব্যাংক নোটের দাম কমে স্বর্ণ মুদ্রার দাম বেড়ে যায়। এর ফলে এখন দুইটি ব্যাংক নোট দিয়ে একটি মূদ্রা আপনাকে নিতে হচ্ছে। আর এই কাজটি করা হতো যাতে জনগণের আমানত কৃত স্বর্ণ নিজের পকেটে ঢুকানো যায়। উদাহরণ দিয়ে বলি: সরকার বা মহাজন এর কাছে ১০০০ স্বর্ণ মুদ্রা ছিলো এবং তার বিপরিতে ১০০০ ব্যাংক নোট জনগণের কাছে ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু এই সরকার বা মহাজন এইবার আরো অতিরিক্ত ১০০০ ব্যাংক নোট ছাপিয়ে বাজারে বা জনগণের নিকট ছেড়ে দিল। এর ফলে এই মহাজনের পকেটে আরো ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা পকেটে ঢুকে গেলো। এইখানে জনগন কে টেকনিক্যালি ধোকা দেওয়া হলো এবং জনগণ ও কিছু করতে পারলো। কারণ কাজটি খুবই ধীরে ধীরে করা হয়েছে। (এইখানে বররতমানে এই মহাজন টি হলো আমেরিকা)

এখান থেকেই শুরু হল ধীরে ধীরে কাগুজে নোটের বিপরীতে স্বর্ণ মওজুদ না থাকার বিষয়টি। একটা সময় আসল যখন কাগুজে নোটের বিপরীতে সরকারের কেন্দ্রিয় ব্যাংকের নিকট চাহিবা মাত্র দেয়ার মত স্বর্ণ মওজুদ নেই। তখন কাগুজে নোটকে সোনার দ্বারা পরিবর্তন সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। এখন এখানে

আপনি সরকার কে মহাজনের সাথে তুলনা করুন। আপনি মহাজনের কাছে ১০০০ স্বর্ণ মূদ্রা জমা দিলেন এবং সে ১০০০ টি কাগুজে নোট দিল আপনাকে। এখন তিন মাস পর মহাজনের কাছে যখন গেলেন তখন মহাজন আপনাকে সাফ সাফ বলে দিল যে সে আপনাকে কোনো ধরনের স্বর্ণ মূদ্রা দিতে পারবে নাহ। (টাকার মাঝে লিখা দেখবেন, চাহিবা মাত্র ইহার বাহক কে দিতে বাধ্য থাকিবে। এখন কে দিতে বাধ্য থাকিবে? অবশ্যই যে নোট ছাপিয়েছে সে, আর সেটি হলো সরকার। কিন্তু সরকার আগে দিতে বাধ্য থাকলেও এখন আর দিতে বাধ্য নাহ। কারণ নিজেরা Law চেঞ্জ করে ফলেছে। এখন জনগণ জনগণ কে দিতে বাধ্য)

১৯৩১ সালে বৃটেন প্রথম এ ঘোষনা প্রদান করে। তবে এ নিষেধাজ্ঞা ছিল দেশের ভেতরে লেনদেনের ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক লেনদেনে প্রত্যেক দেশেই চাহিবা মাত্র স্বর্ণ দিতে বাধ্য ছিল। যেমন, বৃটেনের বেশকিছু পাউন্ড আমেরিকার হস্তগত হল। আর আমরিকা বৃটেনের কাছে পাউন্ডের বিনিময়ে সোনা দাবী করল। এক্ষেত্রে বৃটেনের জন্য অপরিহার্য হবে পাউন্ডের বিনিময়ে আমেরিকাকে সোনা পরিশোধ করা ।

যখন আমেরিকা আর্থীকভাবে চরম সংকটের মুখোমুখি হয়। ডলারের মূল্যমান হ্রাসের কারণে তার স্বর্ণের মওজুদ নিম্ন পর্যায়ে চলে আসে। ১৯৭১ সালে

আমেরিকার বহু স্বর্ণ বাহিরে চলে যায়। তখন উক্ত পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও আমরিকা স্বর্ণ প্রদান বন্ধ করতে বাধ্য হল। সবশেষে ৭৩ এর ১৫ই আগষ্ট আমরিকা ঘোষণা দিল, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও চাহিবা মাত্র অন্যদেশকে স্বর্ণ দিতে পারবে না। এতে কাগুজে নোটকে সোনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠত রাখার সর্বশেষ যে পদ্ধতিটি প্রচলিত ছিল ,তাও এই আইনের মাধ্যমে একেবারে শেষ করে দেয়া হয়। বর্তমানে কাগুজে নোটের বিপরীতে এমন কোন স্বর্ণ মওজুদ নেই যা আপনি চাহিবা মাত্র সরকার আপনাকে দিতে বাধ্য।

বর্তমান মুদ্রার জগত থেকে সোনা একেবারেই অপসারিত। এখন মুদ্রার সাথে সোনার আর কোন সম্পর্কই অবশিষ্ট নেই। প্রশ্ন হতে পারে যে, কাগুজে মুদ্রার বিপরীতে যেহেতু বর্তমানে কোন স্বর্ণ নেই ,তাহলে লেনদেন হয় কিভাবে? ৫০০টাকা নোটের কাগুজের দাম তো ৫০০টাকা নয়? এর জবাব হল, এখন কাগুজে নোট দ্বারা তার স্বত্তা বা মূল অস্তিত্ব উদ্দেশ্য নয়,বরং ক্রয় ক্ষমতার নির্দিষ্ট একটি মানদন্ডকে বর্তমান যুগে মুদ্রা বুঝানো হয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের মানদন্ড এক এক রকম হয়।

ফেডারেল রিজার্ভ সিষ্টেম এর ডলার ছাপাতে খরচ হয় যথাক্রমে (এইখানে সেন্ট এর বদলে এই মূল্যমানের পন্য ও শ্রম দিয়ে হিসাব করবেন। আমি

সহজভাবে বুঝার জন্য সেন্ট উল্লেখ করেছি):

১ ও ২ ডলারে খরচ: ৪.৯ সেন্ট (প্রতি নোটে)
৫ ডলারে খরচ: ১০.৯ সেন্ট (প্রতি নোটে)
১০ ডলারে খরচ: ১০.৩ সেন্ট (প্রতি নোটে)
২০ ও ৫০ ডলারে: ১০.৫ সেন্ট (প্রতি নোটে)
এবং ১০০ ডলারে: ১২.৩ সেন্ট (প্রতি নোটে)
(www.federalreserve.gov/faqs/currency_12771.htm)

এখন ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০ এবং ১০০ ডলার যোগ করলে হয় ১৮৮ ডলার। এই ১৮৮ ডলার বানাতে আমেরিকার ৪৮.৯ সেন্ট খরচ হচ্ছে। ৪৮.৯ সেন্ট এর বাংলা মূল্য হচ্ছে ৩৮ টাকা ৪৬ পয়সা। আর বাংলা টাকায় বাজারমূল্য হলো (১ ডলারে= 78.6424 টাকা) ১৪ হাজার ৭৮৫ টাকা।

তার মানে ৩৮ টাকা ৪৬ পয়সা আমেরিকার হাত ঘুরে বাংলাদেশ এ আসলে এর মূল্য ১৪ হাজার ৭৮৫ টাকা হয়ে যায়! এ থেকে বুঝা গেল আমেরিকার কাছে আলাদীন এর চেরাগ আছে!

৩৮ টাকা ৪৬ পয়সার উপরে আমেরিকা হাত বুলালে ১৪ হাজার ৭৮৫ টাকা

হয়ে যায়। কিন্তু স্বর্ণের উপরে হাত বুলালে কিন্তু স্বর্ণের পরিমাণ আমেরিকা বাড়াতে পারে নাহ।

বাংলাদেশ সরকারের কয়েন ও কাগজের টাকা বানাতে খরচ হয় যথাক্রমে (এইখানে টাকার বদলে এই মূল্যমানের পন্য ও শ্রম দিয়ে হিসাব করবেন। আমি সহজভাবে বুঝার জন্য টাকায় উল্লেখ করেছি):

১টাকার কয়েন তৈরি করতে: ৯৫ পয়সা খরচ হয় ২ টাকার কয়েন: ১ টাকা ২০ পয়সা খরচ হয়। ৫ টাকার কয়েন: তৈরিতে খরচ পড়ে ১ টাকা ৯৫ পয়সা।কয়েনের মান বেশি হলে সে তুলনায় খরচ অনেক কম পড়ে।

এখন আসি কাগুজে মূদ্রার ক্ষেত্রে:

১০০০ টাকায় খরচ : ৭ টাকা

৫০০ টাকায় খরচ: ৬ টাকা

১০০ টাকায় খরচ: ৪ টাকা ৫০ পয়সা

৫০ ও ২০ টাকায়: ২ টাকা ৫০ পয়সা খরচ হয়

১০ টাকার নোটে: ২ টাকা ২০ পয়সা খরচ হয়

৫ টাকার নোটে: ২ টাকা

ও দুইটাকায় খরচ: ১ টাকা ৫০ পয়সা

এখন আপনি কাজ করে ১০০০ টাকা পেলেন। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আপনি পেলেন সাত টাকা এবং ৯৯৩ টাকা সরকারের কাছে জমা। আপনার পকেটে ১০০০ টাকা আছে তারা মানে এই নাহ আপনি পারিশ্রমিক পেয়ে গেলেন। এই ১০০০ টাকাকে চেক এর সাথে তুলনা করেন। এর পর মুদ্রাস্ফিতি, দ্রব্যমূল্য (যেমন গ্যাস) এর দাম বাড়িয়ে দেওয়া, অধিক ট্যাক্স আরোপের কারণে আনুষঙ্গিক পন্যের দাম বেড়ে যায়, এর ফলে সরকারের কাছে আপনার জমা এই ৯৯৩ টাকার মান কমতে কমতে এক সময় হয়ে যায় ৯৫০ টাকা এবং এইভাবেই ধীরে ধীরে কমতে থাকে। সোজা কথা আপনার শ্রমের দাম আপনি নির্ধারণ করছেন নাহ। আগের দিনের জমিদারের মতন সরকার আপনার শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করে দিচ্ছে। আপনি হলেন একজন আজ্ঞাবহ দাস। কিন্তু আপনি যদি ১০০০ টাকা পাওয়ার সাথে সাথে এক কাঠা জায়গা কিনেন, তাহলে এটির দাম কখনোই কমবে নাহ। বরং বাড়বে। তার মানে মূল সমস্যা হলো কাগজে তৈরি টাকা।

আরো সহজ উদাহরণ : ১০ বছর আগে টাকা জমানো শুরু করলেন। চিন্তা করলেন ১০ বছর পরে ২০ লাখ টাকা দিয়ে বাড়ি বানাবেন। আমরা জানি সম্পত্তির দাম বাড়েও নাহ আবার কমেও নাহ। সাধারণত সম্পত্তির এগেইনেষ্ট

এ টাকার পরিমান বেশি হলে এর দাম বেড়ে যায়। আর এর এগেইনেষ্ট এর টাকার পরিমাণ কম হলে সম্পত্তির দাম কমে যায়। এর ১০ বছর পর দেখলেন বাড়ি বনাতে ৬০ লাখ টাকা লাগতেছে। এখন এইখামে ৪০ লাক্ষ টাকা কে খেলো? এইখানে ব্যপারটি হলো সরকার ওই মহাজনের মত অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর ফলে টাকার মান কমে গেছে। এর ফলে ২০ লক্ষ টাকার জিনিস এখন ৬০ লক্ষ টাকা লাগছে। ঠিক উপরের চতুর্থ প্যারাটির মতন সরকার এইখানে মহাজনের মতন অতিরিক্ত নোট ছাপিয়ে এর দাম একেবারে কমিয়ে ফেলেছে। এই ৪০ লক্ষ টাকা চেরাগি নোট (ইন্টারন্যাশনাল কারেন্সি) আমেরিকার পকেটে ঢুকে গেছে। তার মানে আমেরিকা ফকির হলে পুরা বিশ্ব ফকির। আপনি আমেরিকার ডলারের উপরে নির্ভরশীল। এই বিশ্ব আর্থিক মন্দার পিছনে আমেরিকা দায়ী। আমেরিকা ইরাকে যুদ্ধ করেছে তাদের অর্থনৈতিক ধ্বস কাটানোর জন্য। আর ইরাক যুদ্ধের ফলে এই ক্ষতি কিছুটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

আপনি উত্তর কোরিয়ার কাছে ডলার দিলে ছিড়ে ফেলে দিবে ওরা। কিন্তু স্বর্ণ দিলে ওরা সানন্দে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু সোদির কাছে স্বর্ণ দিয়ে তেল কিনতে গেলে সোদি জীবনেও আপনার কাছে তেল বেচবে নাহ। শুধু ডলার দিলেই তারা আপনার কাছে তেল বেচবে। আমেরিকার অর্থনীতি এখন পুরোদমে মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক। অস্ত্র ব্যবসা হতে শুরু করে সব।

ডলারের পতন মানে বিশ্বযুদ্ধ এর শুরু। আর বিশ্বযুদ্ধ এর শুরু মানে বিশ্ব দুর্ভিক্ষের শুরু। কারণ এই সময় ডলার দিয়ে কিছুই পাওয়া যাবে নাহ। এখন বরতমানে যেই দেশে স্বর্ণের মজুদ ও উতপাদন ব্যবস্থা বেশি, সেই দেশে দুর্ভিক্ষের ছোয়া লাগবে নাহ। আমাদের বাংলাদেশ সরকার যত বেশি ডলার রিজার্ভ করতেছে আমেরিকার তত বেশি লাভ হচ্ছে। দুই হাজার ৫০০ কোটি ডলার এর মধ্যে আমদানি রপ্তানির জন্য রেখে বাকীটুকু যদি বিনিয়োগ করে ফেলতো তাহলে বাংলাদেশ এর লাভ হতো।

● **আমেরিকা ও ডলার**

টাকার মান কমছে আর ডলারের দাম বাড়ছেই কারনটা কী? ইউরোপের ভূলের কারনে ১৯৭১ সালে সমগ্র দুনিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। পরিবর্তনটি করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট "রিচার্ড নিক্সন" এই অপকর্মটি করেন বলে এটাকে বলে ‘নিক্সন শক’। মানে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন সারা বিশ্বকে একটা ইলেকট্রিক শক দেন সারা বিশ্বকে। আপনার সম্পদ

কিভাবে টাকায় পরিণত হল তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? টাকা তো কিছু স্পেশালি প্রিন্ট করা কাগজ তাইনা? সরকার যদি ইচ্ছেমতন টাকা প্রিন্ট করে তাহলেই কি সম্পদের মূল পরিমাণ বেড়ে যায়? কখনো ভেবে দেখেছি আমরা? তাহলে তো দুনিয়ার সব সরকারই কোন কাজ কর্ম না করে শুধু টাকাই প্রিন্ট করতো, তাইনা?

প্রকৃতপক্ষে আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে যা উৎপাদন করেন এবং যেই ফসল-ফলাদি উৎপন্ন করেন সেটাই হল আপনার প্রকৃত সম্পদ। সেই প্রকৃত সম্পদের সমতুল্য টাকা প্রিন্ট করা হয়, এর বেশী প্রিন্ট করলে জিনিসের দাম বেড়ে ইনফ্লেইশন হবে, মোট সম্পদ কখনো বাড়বে না। তবে আস্তে আস্তে একটু একটু করে টাকা প্রিন্ট করে বাজারে ছেড়ে দিলে কিন্তু মানুষ ইনফ্লেইশনটা টের পায় না যদি ইনফ্লেইশন হয়ে থাকেও। এবং সম্পদ উৎপাদন যদি টাকার প্রিন্ট করার হার থেকে বেশী হয়, তাহলে কিন্তু ইনফ্লেইশন না হয়ে ডিফ্লেইশন হবে (মানে জিনিসপত্রের দাম কমবে)।

প্রথমে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা – এসব ধাতুর মুদ্রা। এসব ধাতু ব্যবহারের সুবিধা হল এসব ধাতুর নিজস্ব একটা বাজার মূল্য আছে, প্রিন্টের টাকার মতন এটা ইচ্ছেমতন প্রিন্ট করা যায় না বরং খনি থেকে তুলে বাজারে ছাড়তে হয়। তবে এসব মুদ্রা বহন করা কষ্টসাধ্য হওয়ায় একসময়

ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো স্বর্ণমুদ্রাকে ব্যাংকে জমা রেখে স্বর্ণমুদ্রার ইক্যুইভ্যালেন্ট ‘প্রিন্ট করা টাকা’ বাজারে ছাড়তে লাগলো। নিয়ম করা হল যে যখন তখন ইচ্ছে করলে প্রিন্ট করা টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে স্বর্ণ ব্যাংক থেকে তুলে নেয়া যাবে। তার মানে তখন পর্যন্ত ‘প্রিন্ট করা টাকা’ হল স্বর্ণের রিসিট। [তবে তারা একটু চালাকি করলো, যতটুকু স্বর্ণ জমা থেকে তার প্রায় দশ গুন টাকা বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা করলো (এক্ষেত্রে রিজার্ভ রেশিয়ো হয় ১০%)। কারণ সব মানুষ কিন্তু একসাথে ব্যাংকে গিয়ে টাকাকে স্বর্ণে রুপান্তর করেনা।]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সব ইউরোপিয়ান নেশন গুলো তাদের স্বর্ণগুলো নির্দিষ্ট ডলার রেইটে (এক আউন্স = ৩৫ ডলার এই রেটে) আমেরিকায় জমা রাখলো, আর আমেরিকার সাথে চুক্তি করলো যে যখনই তাদের দরকার হবে আমেরিকাকে প্রিন্টেড কারেন্সি দিবে, বিনিময়ে আমেরিকা গোল্ড ফিরত দিবে। (ওরা হয়ত ভয় পাচ্ছিল, হিটলার ইউরোপ দখল করে ফেললে সব স্বর্ণ হিটলারের হস্তগত হবে।) এই ব্যবস্থার নাম ছিল ‘ব্রিটন উডস সিস্টেম’, এটা ৪৪ টি ইউরোপীয় দেশের সাথে আমেরিকার একটা অর্থনৈতিক চুক্তি। সবাই আমেরিকান ডলার কমন কারেন্সি হিসেবে ব্যবহার করে, কারণ গোল্ড ভল্টে রাখা অনিরাপদ।

এখন আমেরিকা হল অতিচালাক। তারা দেখলো তারা ইচ্ছা করলে এই গোল্ড

ব্যবস্থাটা উঠিয়ে দিয়ে সারা দুনিয়াকে ডলার খাওয়াতে পারে। তাই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নিক্সন ১৯৭১ সালে ঘোষণা করলো তারা আর ব্রিটন উডস সিস্টেম মানবে না, তারা নির্দিষ্ট কোন ডলার রেটে স্বর্ণ বেচাকেনা করবে না। স্বর্ণের দাম হবে অনির্দিষ্ট। মানে মার্কেট অটোমেটিকালী স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করবে। সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ডলার হয়ে গেলে ভাসমান মুদ্রা, এর এখন থেকে গোল্ডের উপর কোন ডিপেন্ডেন্সি নাই। ডলার আজ থেকে স্বর্ণ হতে স্বাধীনতা পেল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এতে শক খাওয়ার কি আছে আসলে? ডলার গোল্ড থেকে মুক্ত হলে বাংলাদেশে বসে আমার অসুবিধা কি? শুধু অসুবিধা না, ব্যাপক অসুবিধা। অ- আমেরিকান আর আমেরিকান সবারই ব্যাপক সুবিধা। কারণ, সব দেশকে ফরেইন রিজার্ভ আগে রাখতে হতো গোল্ডে। এখন সবাই রাখে ডলারে। গোল্ড থাকে আমেরিকায়। আমাদের ভল্টে থাকে শুধুই ডলার, যাহা কাগজ ছাড়া কিছুই নহে। এখন মনে করেন বাংলাদেশে ফরেইন রিজার্ভ ২২ বিলিয়ন ডলার। এই ২২ বিলিয়ন ডলারের প্রকৃত মূল্য মনে করেন ২২ টন গোল্ড (ধরে নেন আরকি)। এখন, আমেরিকা করেকি, নিজেদের যুদ্ধ পরিচালনা স্ংক্রান্ত ব্যয়, ইন্টারনাল ক্রাইসিস এগুলা সামাল দেয়ার জন্য কোন উপায়ন্তর না পেয়ে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ছাপায়, এরপর এই ডলার সারাদুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ডলার ছাপানোয়, ডলারের মান কমে যায়, ব্যাপক ইনফ্লেইশন হয়। ফলে মনে করেন, মাত্র দশ মাসের মধ্যে ২২ বিলিয়ন ডলারের মূল্য কমে মাত্র ১১ টন গোল্ড হয়ে যেতে পারে। মানে অন্য

কথায়, যেকোন পণ্যের দাম ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে প্রায় দ্বিগুন হয়ে যাতে পারে। মানে আপনার জমাকৃত অর্থের মূল্য ডেঞ্জারাসলি কমে যেতে পারে। এবং তা কমছেও।

আমেরিকা ইচ্ছাকৃতভাবে ডলার প্রিন্ট করে নিজেদের ধার দেনা শোধ করছে, নিজেদের মার্কেট টেনে টুনে সেইভ করছে, এবং সাথে সাথে সারা দুনিয়াই আমেরিকার যুদ্ধ এবং অন্যান্য ব্যয়ভার ইনডিরেক্টলি বহন করছে। তার মানে আপনার চাকরি-ব্যবসাকৃত অর্জিত সম্পদ কে ওয়াশিংটন ডিসিতে বসে কিছু লোক ডলার প্রিন্ট করার মাধ্যমে কমিয়ে দিচ্ছে। বা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা দুনিয়ার কিছুই করার নেই, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে। আসলে এইটাই দুনিয়ার সবচে’ বড় চৌর্যবৃত্তি। আপনার যে মাসের বেতনে পেট চলেনা, তার কারণ হল আমেরিকানদের ওয়াশিংটন ডিসিতে বসে কিছু লোকের ডলার প্রিন্ট করা, বুঝা গেল? আমেরিকান ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক (সব প্রাইভেট ব্যাংকারদের এসোসিয়েশণ) বারাক ওবামার অনুমতি ক্রমে ব্যাংকগুলোকে সেইভ করার জন্য যখনই এক ট্রিলিয়ন ডলার প্রিন্ট করার সিদ্ধান্ত নিল, তখনই বুঝবেন, আসলে ওরা আপনার পকেট (আসলে সারাদুনিয়ার সকল মানুষের পকেট থেকে) থেকে এই টাকা টান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মাহাথির মোহাম্মদের ক্ষমতায় থাকা কালে একবার মালয়েশিয়ায় ইকোনমিক

ক্রাইসিস দেখা দিল, ১৯৯৯ সাল হবে। তো আনোয়ার ইব্রাহিম সহ সকল অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড থেকে পি এইচডি করা লোকজন মাহাথির কে বুদ্ধি দিলো হেন করতে হবে, তেন করতে হবে। মাহাথির বললো, " কিচ্ছু করা লাগবেনা, ডলার রেটটা আসলে চেঞ্জ করতে হবে, তোমরা ইকোনমি'র কি বুঝ!!"
মাহাথির ডলার রেটটা ফিক্স করে চেঞ্জ করে দিলো, মুহূর্তের মধ্যে মালয়েশিয়ার ইকোনমিক ক্রাইসিস শেষ। এটা ছিল মাহাথির এক বিশাল পলিটিকাল উইন। দুনিয়ার ইতিহাস করলো মাহাথির, কারণ পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে প্র্যাকটিকাল নলেজ এই মাহাথির এর মাথায় আল্লাহ বেশী দিছেন।।
যাই হোক, তো এর সমাধান কি?

সমাধান হল, ইন্টারন্যাশল মুদ্রা হিসেবে আবারও গোল্ডকে (মানে গোল্ড, সিলভার এবং তামা) ব্যবহার করা। গোল্ড কারেন্সির ইচ্ছামতন প্রিন্ট করা যায় না। গোল্ডের ইকুইভ্যালেন্ট মানি ছাড়া যেতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক লেনদেন অবশ্যই গোল্ডের রেসপেক্টে হতে হবে, ডলার দিয়ে নয়।

শুধু ডলার প্রিন্ট করে সারা দুনিয়ায় তা ছড়ানোর ব্যবস্থাটা আছে বলেই আমেরিকা এখনও টিকে আছে। না হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতন আমেরিকার ও পতন এতদিনে হয়ে যেতো। সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্ভাগ্য, যে তাদের রুবল সারা দুনিয়ার কমন মুদ্রা না। ইরাকে আর আফগানিস্তানে তো কত

ট্রিলিয়ন খরচ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, সারা দুনিয়ায় আমেরিকার ১৬ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ, তাও কোন সমস্যা নেই, কারণ আমেরিকা শুধু ডলার প্রিন্ট করে, প্রিন্ট করে ঋণ শোধ করে, আর যেই ইনফ্লেইশনটা হয়, তা সারা দুনিয়া একসাথে বহন করে, তাই আমেরিকার গায়ে লাগেনা। এটা মনে রাখবেন, আপনি, আমি সবাই ইনডিরেক্টলি ইরাক, আফগানিস্তান, ইসরাইল সব জায়গায় যুদ্ধের খরচ আমেরিকাকে যুগিয়ে যাচ্ছি। কারণ আমরা ডলার ব্যবহার করছি। যতদিন গোল্ড ফিরে না আসে, ততদিন এই ব্যবস্থাই চলবে।

[উপরের আলোচনার পর সংযুক্ত লিখনি]

মনে করুন,
সুইস ব্যাংকে আপনি দশ মিলিয়ন ডলার জমা করে রেখেছেন। কিংবা আপনার হাতে আছে একটি ক্রেডিট কার্ড, যা দিয়ে যেকোনো সুপার শপ থেকে যেকোনো সময় আপনি ইচ্ছেমতো পণ্য ক্রয় করতে পারেন। আপনি নিজেকে অনেক ধনী ভাবছেন। ভবিষ্যৎ-সংকটে এটাকে শক্তিশালী রিজার্ভ মনে করছেন। ক্রেডিট কার্ড নিয়ে অনেক ফুরফুরে মেজাজে আছেন। নিশ্চিন্তে রঙিন জীবনের প্ল্যান সাজিয়ে চলছেন। কিন্তু হায়, যদি জানতেন যে, আপনি কত বড় ভুলের মধ্যে আছেন! শুধু ভুলই নয়; এ যে এক মহাভুল!

দুঃসময়ে যে মহাভুলের মাশুল গোনারও সুযোগটুকু পাবেন না।
আপনার এ দশ মিলিয়ন ডলার যেকোনো মুহূর্তেই গায়েব হয়ে যেতে পারে।
হয়ে যেতে পারে সব হঠাৎ করেই মূল্যহীন কিছু কাগজ। কোনো এক সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনবেন, আপনার জীবনের সঞ্চিত সব ডলার আজ থেকে কেবলই কাগজের কিছু টুকরো। জি হ্যাঁ, কেবলই কাগজের টুকরো; বরং তার চাইতেও মূল্যহীন।

আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই তো! পাগল ভাবছেন? জি না, আমি ভুল বলছি না, পাগলামিও করছি না। আপনাকে শোনাচ্ছি আমি আশু বিপর্যয়ের এমন কিছু তিক্ত সত্য, যে ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই উদাসীন।

পৃথিবীতে মজুত সমুদয় স্বর্ণের বিরাট একটি অংশই আজ আমেরিকার হাতে।
পৃথিবীতে সর্বাধিক স্বর্ণের মালিক আমেরিকার হাতে রয়েছে ৮১৩৪ টন স্বর্ণ।
দ্বিতীয় সর্বাধিক স্বর্ণের দেশ জার্মানির হাতে রয়েছে ৩৩৬৭ টন স্বর্ণ।
এরপর ইতালির কাছে রয়েছে ২৪৫২ টন,
এরপর ফ্রান্সের কাছে ২৪৩৬ টন,
এরপর রাশিয়ার কাছে ২২১৯ টন,
এরপর চীনের কাছে ১৯৩৭ টন, এরপর সুইজারল্যান্ডের কাছে ১০৪০ টন,
এরপর জাপানের কাছে ৭৬৫ টন,

এরপর ভারতের কাছে ৬১৮ টন,

এরপর নেদারল্যান্ডের কাছে ৬১৩ টন।

দেখা যাচ্ছে, স্বর্ণ মজুতের তালিকায় বিশ্বের প্রথম দশটি রাষ্ট্রের মধ্যে কেবল আমেরিকার হাতেই রয়েছে এক তৃতীয়াংশের বেশি স্বর্ণ।

এত স্বর্ণ সে পেল কোথায়?

নিজেরা স্বর্ণ তৈরি করেছে?

নিজ দেশের খনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলন করেছে?

জি না; বরং লুট করেছে।

বলা যায়, এক প্রকারের ডাকাতি করেছে।

বিশ্বকে ডলার নামে কিছু কাগজের টুকরো দিয়ে বিনিময়ে তারা স্বর্ণ গ্রহণ করে নিজ দেশে

গড়ে তুলেছে স্বর্ণের বৃহৎ মজুত।

কিন্তু কীভাবে সে বিশ্বকে বোকা বানিয়ে

এটা চালু করল?

পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত বিশ্বকে বোকা বানানোর যতগুলো কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, তন্মধ্যে ডলারভিত্তিক এ মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলনটা ছিল সবচেয়ে ভয়ানক, সূক্ষ্ম ও ক্ষতিকর। [যা আপনারা উপরে পড়ে এসেছেন] আজ

যদিও বিশ্বের অনেক দেশ ধোঁকাপূর্ণ এ ব্যবস্থার বিষয়টি বুঝতে পারছে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাশিয়া, চীন, ইন্ডিয়াসহ এ মুহূর্তে সবাই গোল্ড জমা করার চেষ্টায় নেমেছে।

আর জনগণ যেন এ ব্যাপারে সতর্ক ও সজাগ হওয়ার অবকাশ না পায়, তারা যেন গোল্ডের পিছনে না ছোটে, সেজন্য দাজ্জালি মিডিয়াগুলো বিভিন্নভাবে গোল্ড কিনতে অনুৎসাহিত করছে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও এর ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে।

আমেরিকা আজ ডলারকে বাতিল ঘোষণা করে গোল্ড সিস্টেম মুদ্রা চালু করলে আমি আপনি সবাই হয়ে পড়ব কর্পদহীন পথের ফকির। আপনার দশ মিলিয়ন ডলার দিয়ে শুধু ঘরের দেয়ালটাই সাজাতে পারবেন, আর কিছু নয়।
এ আশঙ্কা এতদিন হালকাভাবে দেখা হলেও বর্তমান বিশ্বের নানা প্রেক্ষাপটে এটা এখন ভয়ংকর এক বাস্তবতা হয়ে দেখা দিচ্ছে।

বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন সাদ্দাম হোসেনের সরকার পতনের পর নতুন দিনার ইস্যু করা হলো, তখন পুরাতন সব দিনার হয়ে গেল একেবারে মূল্যহীন। মানুষ তাদের দিনারের নোটগুলো রাস্তায় ফেলে দিল। এক টুকরো সাদা কাগজের মূল্যও ছিল না সেগুলোর! কারণ, ওই দিনারগুলো দিয়ে আর

কোনো লেনদেন করার সুযোগ ছিল না।
অনুরূপ করোনা-পরবর্তী বৈশ্বিক বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যার কারনে এদেশের অর্থব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসতে পারে। আর সেটা হলে আপনিও কিন্তু বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। আপনার টাকাগুলো যেকোনো মুহূর্তে মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে; যেমনটি ভারতে একবার ঘটেছিল।
আর ব্যাংক যদি দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহলে আপনার সারাজীবনের কষ্টার্জিত সঞ্চয়ের কী অবস্থা হবে, তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন?

বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ অনুসারে শীঘ্রই হয়তো কাগজের মুদ্রাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে।
আর এটার সূচনা হতে পারে আন্তর্জাতিকভাবে ডলারভিত্তিক লেনদেন বাতিল হওয়ার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন ঘটনাবলী ও নিদর্শন থেকে অনুমেয় হচ্ছে, অচিরেই হয়তো বৃহৎ শক্তিগুলোর মাঝে যুদ্ধ শুরু হবে। হাদিসে বর্ণিত মালহামা বা রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধের কালও সন্নিকটে মনে হচ্ছে। করোনা-পরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনীতিতেও যে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে, এ ব্যাপারে কারও সন্দেহের অবকাশ নেই।
এছাড়াও বিভিন্ন দুর্যোগ, ভূমিকম্প, সিস্টেম ক্রাশ
বা বিদ্যুৎ ও নেটব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেলে ব্যাংকে রাখা টাকাগুলো যে সব জলে যাবে, সেটাও সুনিশ্চিত। এগুলো শুধু সম্ভাবনার কথাই বলছি না; বাস্তবেই

ঘটতে পারে বলে এ ব্যাপারে অনেক
বিশেষজ্ঞ ও গবেষক কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। সবগুলো বিষয় সামনে রাখলে বিবেকবান মাত্রই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, ব্যাংকে কাগুজে টাকা রাখা ও এর ওপর নির্ভর
করে বসে থাকাটা কত বড় বোকামি!।

বুঝতেই পারছেন, ফালতু এই কাগুজে মুদ্রাব্যবস্থার কারণে আমরা কতটা রিস্কের মধ্যে আছি!?
এটা ঠিক যে, জঘন্য এ ডলারব্যবস্থা বা কাগুজে মুদ্রা আমরা এখন ইচ্ছে করলেও পরিবর্তন করতে পারব না। তবে আমরা সবাই সচেতন হয়ে কমপক্ষে নিজে বা নিজের ঘনিষ্ঠদের তো সর্তক করতে পারি।

দাজ্জালের আবির্ভাব নিকটবর্ত্তী ইনশাআল্লাহ
সে পৃথিবীর সব সম্পদ নিজ হাতে নিয়ে নেবে।
তখন মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে হবে খাদ্য ও পানির সংকট।
প্রস্তুতিহীন দুর্বল ইমানদাররা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে দাজ্জালকে নিজেদের ইলাহ ও রব হিসেবে মেনে নেবে।
অথচ তারা যদি আগ থেকেই এ ব্যাপারে সচেতন থাকত, হাদিসের নির্দেশনা

অনুযায়ী নিজের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখত, তাহলে সে কঠিন মুহূর্তে তাকে ইমান হারাতে হতো না। তাই এখনই সঠিকভাবে আর্থিক পরিকল্পনা করে রাখুন।

মনে রাখবেন, দেশের সরকার বহাল থাকুক
বা না থাকুক, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসুক
 বা না আসুক, মুদ্রাব্যবস্থা ভেঙে পড়ুক বা না পড়ুক, সর্বাবস্থায় আপনার স্বর্ণ, রূপা ও ভোগ্য পণ্যসমূহের মূল্য কখনোই পরিবর্তন হবে না। কারণ, এগুলোর নিজস্ব মূল্য (সেলফ ভ্যালু) ও উপযোগ আছে। কেউ চাইলেও তা বাতিল করতে পারবে না।

মুদ্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো,
এটার নিজস্ব মূল্য বা তার উপযোগ থাকতে হবে এবং তা কখনো মূল্যহীন বস্তু (যেমন, কাগজ) হতে পারবে না। স্বর্ণ-রূপা এমন দুটি পদার্থ, যা মানবসভ্যতার শুরু থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত মূল্যবান হিসেবে পরিগণিত। এ দুটি জিনিস কখনো ভ্যালু হারিয়ে মূল্যহীন হবে না। অনুরূপ চাল-ডাল, গম, চিনি, আটা, লবণ ইত্যাদি প্রতিটি ভোগ্য পণ্যের নিজস্ব উপযোগ আছে এবং তা হলো আমাদের ক্ষুধা মেটানোর ক্ষমতা।
এমন নয় যে, সরকারের অধ্যাদেশে এসব ভোগ্য
পণ্যের উপযোগ কখনো বাতিল হয়ে যেতে পারে।

তাই পৃথিবীর যেখানেই যান না কেন, প্রতিটি ভোগ্য পণ্যের উপযোগ প্রায় একই থাকে, অর্থাৎ তাদের নিজস্ব একটি মূল্য সব সময়ই থাকে। একইভাবে গবাদি পশু-পাখির কথাও বলা যায়। এগুলোর উপযোগেও তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না।

আমাদের অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে,

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশ বছর পূর্বেই উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন।
তিনি ইরশাদ করেন :—

'মানুষের সামনে নিশ্চিতই এমন এক সময় আসবে, যখন দিনার (গোল্ড) ও দিরহাম (সিলভার) ছাড়া কোনো কিছুই কাজে আসবে না।' (মুসনাদু আহমাদ : ১৭২০১)

মুজামে কাবিরের বর্ণনায় এসেছে :—

'মানুষের সামনে এমন একটি সময় আসছে, যখন যার কাছে হলুদ (গোল্ড) ও সাদা (সিলভার) বস্তু থাকবে না, সে স্বাচ্ছন্দ্যে নিদ্রাও যেতে পারবে না।'

(আল-মুজামুল কাবির : ২০/২৭৮)

আরেকটি সনদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :—

‘যখন শেষ জমানা আসবে তখন লোকদের দিনার (গোল্ড) ও দিরহাম
(সিলভার) ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।
(মুমিন) লোক তখন এগুলোর দ্বারা তার দ্বীন
ও দুনিয়ার সকল বিষয় পরিচালনা করবে।’ (আল-মুজামুল কাবির :
২০/২৭৯)

সনদগত দিক থেকে হাদিসগুলো যদিওবা একটু দুর্বল, তবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান বাস্তবতা আমাদের সামনে হাদিসের সত্যতা দিন দিন স্পষ্ট করে তুলছে। স্পষ্টভাবেই আমরা বুঝতে পারছি, কাগুজে মুদ্রা ও ডলারের অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

আমাদের সামনে কী যে মহাসংকট ও দুর্যোগ অপেক্ষা করছে, তা কল্পনা করতে গেলেও শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে! তাই এখন কে কত দ্রুত সবকিছু সামলে নেবে, সেটাই দেখার বিষয়।
এক যুগ আগে একসময় আমারও বুঝে আসত না যে, মানুষ কেন গণহারে

দাজ্জালকে রব বলে মেনে নেবে। পরে আস্তে আস্তে বিষয়টি ক্লিয়ার হতে থাকে। আর এখন তো আলহামদুলিল্লাহ, এটা সূর্যের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

বস্তুত দাজ্জালের ফিতনার বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। এখন কেবল পূর্ণতায় পৌঁছতে বাকি।

আর পূর্ণতায় পৌঁছতেও বেশি সময় নেই বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা-ই ভালো জানেন।

বিটকয়েনঃ দাজ্জালি শাসনব্যস্থায় আগামী দিনের মুদ্রাব্যবস্থা

[ডিজিটাল কারেন্সি]

ক্রিপ্টোকারেন্সি 'বিটকয়েন' পরিচিতি

সাধারণত কাগজের তৈরি প্রচলিত মুদ্রা বা এ সংশ্লিষ্ট কোন ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্বলিত বস্তু ব্যবহার করে বাস্তব জীবনে এবং অনলাইনে লেনদেন সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে কোন প্রকারের সমস্যা ছাড়াই মিটিয়ে ফেলা যায়। তবে বর্তমানে ব্যবহৃত এটিএম কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড অথবা অন্য ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্বলিত বস্তুগুলো ব্যবহারে দুটি বড় সমস্যা রয়েছে। এসবে লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রাহক ও গ্রহিতা উভয়কে তৃতীয় কোন পক্ষের উপর

ট্রাস্ট' বা আস্থা রাখতে হয়, উদাহরণস্বরূপ ব্যাংক। তীয় পক্ষ এই ব্যাংকে উভয় পক্ষ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের মুদ্রা পরিশাোধ করে, যেটিকে ইংরেজীতে বলে 'ডাবল স্পেন্ডিং'।

উপরাোক্ত সমস্যার সমাধানে সাতোশি নাকামোতো ছদ্মনামে একব্যক্তি ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে ৯ পৃষ্ঠার "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic cash System" নামক এক গবেষণা প্রস্তাবনা অনলাইনে প্রকাশ করে। যেখানে প্রথম বিটকয়েন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপে বলা হয়, একটি পিয়ার-টু-পিয়ার (peer-to-peer) ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা পরিশোধের ব্যবস্থা প্রয়োজন, যেটির মাধ্যমে একজন অন্যজনকে কোন তৃতীয় পক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের কাছে না গিয়েই লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবে। একই সঙ্গে 'ডাবল স্পেন্ডিং' থেকে বিরত থাকতে পারবে। এই ব্যবস্থায় সব ধরনের লেনদেন সম্পন্ন হবে আস্থার পরিবর্তে 'কাজের (লেনদেন) প্রমাণের ভিত্তিতে এবং সব ধরনের লেনদেন একটি নিদিষ্ট নেটওয়ার্কে লিপিবদ্ধ হবে। প্রস্তাবনা প্রকাশের পর থেকে সাতোশি বিটকযেন 'মাইনিং' এর জন্য প্রথম সফটওয়্যার তৈরি করে। 'মাইনিং' হচ্ছে যে পদ্ধতিতে বিটকয়েন তৈরি করা হয়। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে সাতোশি প্রথম বিটকয়েন মুদ্রা রিলিজ করে। এই সাতোশি নাকামোতোর আসল পরিচয় আজও অজানা।

Bitcoin' - ইংরেজীতে B, ক্যাপিটাল লেটারে হচ্ছে একটি পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক যেখানে আস্থাভাজন তৃতীয় পক্ষ ছাড়াই মুদ্রার মালিকানা পরিবর্তন সম্ভব, আর এই নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত একক হচ্ছে 'bitcoin'ইংরেজীতে b, স্মল লেটারে – যেটি সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল উপায়ে ক্রিপ্টোগ্রাফির মাধ্যমে কম্পিটার কোডিং ব্যবহার করে তৈরি হয়।

- বিটকয়েনের বৈশিষ্ট্য

সম্পূর্ণ ডিজিটাল উপায়ে তৈরি, বাস্তবে এটির কোন ফিজিক্যাল (physical) অস্তিত্ব নেই। কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটি নিয়ন্ত্রণ করেনা। ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী এটি ব্যবহারের ফলে এর মুদ্রা ব্যবস্থা চলমান রয়েছে। পিয়ার-টু-পিয়ার ব্যবস্থার কারণে কোন প্রতিষ্ঠান বা মিডলম্যান ছাড়াই সরাসরি লেনদেন সম্পন্ন হয়। ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যবহৃত হওয়ার কারণে উপযুক্ত অনুমতি ছাড়া বিটকয়েনের অ্যাকসেস নেওয়া অসম্ভব। সর্বোপরি, বিটকয়েনে সম্পূর্ণরূপে ছদ্মনামে লেনদেন সম্ভব। প্রচলিত মুদ্রা এবং বিটকয়েনের মধ্যে পার্থক্য পৃথিবীব্যাপী ব্যবহৃত প্রচলিত মুদ্রাগুলো মূলত কাগজের তৈরি। যেকোন প্রকারের সেবা আদান-প্রদানের হিসাব নিকাশের মূলে থাকে কাগজের তৈরি মুদ্রা। যে উপায়েই সেবা আদান-প্রদানের করা হোকনা কেন, মুখোমুখি সেবা

দেওয়া-নেওয়া, অনলাইনে সেবা দেওয়া-নেওয়া, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা আদান-প্রদান ইত্যাদি।

ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যবহার করে তৈরি করা বিটকয়েন একধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি। প্রচলিত মুদ্রা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সরি মধ্যকার প্রধান পার্থক্য হলাে ফিজিক্যাল অস্তিত্বের কারণে প্রচলিত মুদ্রা হাতে হাতে ব্যবহার করা যায়, হাতে নেওয়া যায়। অন্যদিকে ক্রিপ্টোকারেন্সি শুধু ব্যবহার করা যায়। ভার্চুয়াল অথবা ডিজিটাল হওয়ার কারণে এটি শুধু ব্যবহার করা যায়,কখনাে হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক হওয়ার কারণে বিটকয়েনের ট্রানজিকশন বা লেনদেন সেবা দাতা ও গ্রহিতার 'ওয়ালেট' থেকে 'ওয়ালেটে' সম্পন্ন হয়। ‘ওয়ালেটে' বিটকয়েন সঞ্চিত রাখা থাকে। এটি অনলাইন বা অফলাইন দু'রকমেই হতে পারে। একজন বিটকয়েন ব্যবহারকারীকে দুটি 'কি' (Keys) ব্যবহার করতে হয়। একটি পাবলিক কি' (Public Key), এটি সবার জন্য উন্মুক্ত। অন্যটি প্রাইভেট কি (Private key), এটি সর্বদা গাােপন থাকে এবং লেনদেনের নিশ্চয়তার জন্য ব্যবহৃত হয়। ট্রানজিকশনের ইতিবৃত্ত একটি উন্মুক্ত খতিয়ানে (পাবলিক লেজার) রেকর্ড করা থাকে, যাকে 'রক চেইন' (Block chain) বলে। এক্ষেত্রে 'পাবলিক কি' ব্যবহার করা হয় এবং একই লেনদেন একই ব্যবহারকারীর মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি করা যায়না। ব্লকচেইনে সর্বপ্রথম ট্রানডিকশনের হিসাব থেকে আজ পর্যন্ত সব হিসাব সংরক্ষিত আছে এবং নিয়মিতভাবে আপডেট হচ্ছে।

- বিটকয়েনের অপকারিতা কি?

তথ্য ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ লেখক কেন হাসের মতে, বিটকয়েনের কয়েকটি অপকারিতা রয়েছে।

প্রথমতঃ লেনদেন পুনরাবৃত্তি না করতে পারার কারণে, সেবা গ্রহিতা সংশ্লিষ্ট সেবা না পেলে, মুদ্রা ফেরত পাওয়ার কোন উপায় নেই।

দ্বিতীয়তঃ বিটকয়েন ওয়ালেট হারিয়ে বা নষ্ট (ড্যামেজ) হয়ে গেলে এটি আর ফিরে পাওয়া যায়না। যেটি আমাদের ব্যবহৃত মানিব্যাগ বা মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়।

তৃতীয়তঃ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বিটকয়েন খুব বেশি অস্থিতিশীল।

চতুর্থতঃ যদিও বিটকয়েনের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, কিন্তু সেটি প্রচলিত মুদ্রার তুলনায় খুবই সীমিত পরিসরে। সুতরাং এটিকে প্রচলিত মুদ্রায় পরিবর্তন করে ব্যবহার করতে হয়।

সর্বোপরি, বিটকয়েনে কোন ক্রেডিট ব্যবস্থা নেই। যদিও এটি একটি ভাল দিক,

কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি চলছে ক্রেডিট নির্ভর। ক্রেডিটের উপর ভিত্তি করে আমরা অগ্রীম সেবা নিয়ে থাকি।

বিটকয়েন মাইনিং একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রয়াস। বিটকয়েন মাইন করতে ব্যবহৃত বিভিন্ন হ্যাশিং প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যমে এক ধরনের "সেরা অস্ত্রশস্ত্র লাভের প্রতিযোগিতা" দেখা গিয়েছে। অনেক গেমিং কম্পিউটার, এফপিজিএ এবং এএসআইসিতে থাকা সাধারণ সিপিইউ, উচ্চতর জিপিইউব্যবহার করে স্বল্প বিশেষায়িত প্রযুক্তির লাভের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। বিটকয়েনের জন্য বিশেষায়িত এএসআইসি এখন বিটকয়েন মাইনিং এর জন্য মৌলিক উপায়ে পরিণত হয়েছেএবং জিপিইউ-র গতিকে ৩০০ গুণেরও বেশি ছাড়িয়ে গেছে। যেহেতু বিট কয়েন মাইন করা আরও কঠিন হয়ে গেছে, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চগতির এএসআইসি পণ্যের বিক্রির হার বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করছে।

মাইনার থেকে আয়ের মধ্যে ভিন্নতা কমানোর জন্য কম্পিউটারের ক্ষমতাকে প্রায়ই একসাথে জড়ো করা বা জমা ("পুলড") করা হয়। প্রতিটি মাইনিং রিগকে লেনদেন ও প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। অংশগ্রহণকারী সার্ভার প্রতিবার যখন একটি ব্লকের সমাধান করতে পারে, একটি পুলে অংশগ্রহণকারী সকল মাইনারকে অর্থ পরিশোধ করা হয়।

সেই ব্লকটি খুঁজে পেতে প্রতিটি মাইনারের কাজের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে এই অর্থ দেয়া হয়। বিটকয়েন তথ্য কেন্দ্রগুলো সাধারণত লোকচক্ষুর বাইরে ও বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, এছাড়া কম খরচে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় এমন এলাকার চারদিকে কেন্দ্রগুলোর গুচ্ছাকারে থাকার প্রবণতাও দেখা যায়।

- বিট কয়েন মাইনিং :

একটি বন্টিত টাইমস্ট্যাম্প সার্ভারকে পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক হিসেবে তৈরি করার জন্য বিটকয়েন "প্রুফ অফ ওয়ার্ক নেটওয়ার্ক" ব্যবহার করে। এই কাজকে প্রায়শই বিটকয়েন মাইনিং বলা হয়। এক্ষেত্রে স্বাক্ষর দেয়া থাকে না ,বরং স্বাক্ষরটি খুঁজে বের করা হয়। এ প্রক্রিয়াটি শক্তির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। মাইনার পরিচালনার জন্য মোট খরচের ৯০ শতাংশের বেশি বিদ্যুতের জন্য ব্যয়িত হয়। চীনে মূলত বিটকয়েন মাইনিং এর জন্য স্থাপিত একটি তথ্যকেন্দ্র পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ ১৩৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত ক্ষমতার প্রয়োজন হয়।

সাতোশি নাকামতো-র মূল উদ্ভাবন ছিল ব্লকচেইনের জন্য দরকারি স্বাক্ষর দেয়ার জন্য একটি প্রুফ অফ ওয়ার্ক বা কাজের প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করা। মাইনিং প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে একটি ব্লক চিহ্নিত করা, যা এসএইচএ-২৫৬ র সাথে বার দুয়েক হ্যাশ করা হলে প্রদত্ত কাঠিন্যের লক্ষ্যের তুলনায় ছোট সংখ্যার যোগান দেয়। যেখানে প্রয়োজনীয় গড় কাজের পরিমাণ কাঠিন্যের

লক্ষ্যের বিপরীত অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, সেখানে এক রাউন্ড দ্বৈত এসএইচএ-২৫৬ চালু করে সব সময়ই একটি হ্যাশকে যাচাই করা যায়।

বিটকয়েন টাইমস্ট্যাম্প নেটওয়ার্কের জন্য এক বার ব্যবহারযোগ্য যে কোন একটি সংখ্যার মান বৃদ্ধি করে বৈধ কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্লকের হ্যাশকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্রগামী শূন্য বিট দেয়ার মত মান পাওয়া না যায়, সংখ্যার মান ততক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। একবার যখন হ্যাশ প্রক্রিয়াটি একটি বৈধ ফলাফল প্রদান করে, ব্লক কাজটি পুনরায় সম্পাদন করার আগ পর্যন্ত আর পরিবর্তিত হতে পারে না। পরে যখন ব্লকগুলো এর সাথে শৃঙ্খলিত হয়, পরবর্তী প্রতিটি ব্লক পরিবর্তন করার জন্য পুনরায় কাজ করতে হয়।

সবচেয়ে বড় চেইনটি দিয়ে বিটকয়েনে বেশিরভাগের ঐক্যমত্য প্রকাশ করা হয় আর এই চেইনটি তৈরি করার জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। যদি ক্ষমতা পরিমাপের বেশির ভাগ অংশ সৎ নোড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে সৎ চেইনের সংখ্যাও সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং তা যে কোন প্রতিযোগী চেইনকে ছাড়িয়ে যাবে। বিগত কোন ব্লককে পরিবর্তন করতে হলে, কোন আক্রমণকারীকে সেই ব্লক ও তার পরবর্তী সকল ব্লকের কাজের প্রমাণ অংশটি পুনরায় করতে হবে এবং সৎ নোডের কাজকে ছাপিয়ে যেতে হবে। পরবর্তীতে যতই ব্লক যোগ করা

হয়, ততই ধীরগতির কোন আক্রমণকারীর পক্ষে এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারার সম্ভাব্যতা সূচকীয়ভাবে হ্রাস পায়।

- বিটকয়েনের প্রতিদ্বন্দ্বীঃ

বর্তমানে ৪৫৪ রকমের ক্রিপ্টোকারেন্সি বিশ্বব্যাপী কমবেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এর মধ্যে Litecoin এবং Ripple অন্যতম। অন্য ক্রিপ্টোকারেন্সগুলাে। বিটকয়েনের মত এতটা ব্যবহৃত হয়না। আপাতদৃষ্টিতে Litecoin-কে বিটকয়েনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবা হলেও, এটির সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ।

- বাংলাদেশ ও বিটকয়েনঃ

এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ২০১৪ সালে বিটকয়েন ফাউন্ডেশন এর অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলাদেশ। তবে কিছুদিনের মধ্যেই বিটকয়েন এর উপর বাংলাদেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

- বিটকয়েনের মূল্য

বিটকয়েনের মূল্য খুবই অস্থিতিশীল। প্রতি মুহূর্তেই এর মূল্য পরিবর্তিত হয়। শুরুর দিকে এর বাজার মূল্য ছিল ০.৩২ ডলার। এটি প্রতি বছরই বাড়তে বাড়তে ২০১৭ সালে আকাশচুম্বী হয়ে দাঁড়ায়। এর মূল্য ১৫ হাজার ডলার

ছাড়িয়ে যায় একসময়। এর বর্তমান বাজার মূল্য ৬৪০০ ডলারের কাছাকাছি। এমনও হতে পারে যে এই মূল্য আগামীকাল সকালে আকাশ পাতাল পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

মহামারীতে বিভিন্ন দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ অর্থপ্রবাহ বাড়াচ্ছে এবং সুদহার কমিয়ে শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসছে। এজন্য বিকল্প স্থিতিশীল সম্পদ হিসেবে বিনিয়োগকারীদের কাছে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। আর বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ পেয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে বিটকয়েনের দাম। ২০০৯ সালে চালু হওয়ার পর এই প্রথম বিটকয়েনের দাম ২০ হাজার ডলার ছড়িয়ে গেছে। খবর বিবিসি।

স্টক মার্কেটের অস্থিরতায় এ বছর ভার্চুয়াল মুদ্রাটির দাম ১৭০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। বুধবার ৪ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়ে ২০ হাজার ৪৪০ ডলারে পৌঁছেছে। এমনও প্রত্যাশা রয়েছে, এটি স্টারবাক্স ও মাইক্রোসফটের অর্থ প্রদানের পদ্ধতি হিসেবে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে।

২০১৭ সালে একবার রেকর্ড দাম বেড়ে গিয়েছিল এই ডিজিটাল মুদ্রার। ওই বছরের শেষ দিকে বিটকয়েনের দাম ১৯ হাজার ৭৮৩ ডলারে পৌঁছে যায়। কিন্তু কেনাবেচা শুরু হতেই পরিস্থিতি বদলে যায়। এক বছর পর বিটকয়েনের দাম

কমে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৩ ডলার।

পাউন্ড, ডলারসহ বাস্তব মুদ্রার মতো বিটকয়েনেও ব্যাপকভাবে ব্যবসা হয়। তবে সাম্প্রতিক দিনগুলোয় প্রভাবশালী বিনিয়োগকারীরা বিটকয়েনের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। বিশেষ করে যখন পেপাল ও ভিসার মতো প্রভাবশালী লেনদেন প্রতিষ্ঠান ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণ শুরু করেছে তখন অন্যরা তার সম্ভাবনার সুযোগ নিতে চাইছে। যদিও ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি অর্থ প্রদানের উপায় হিসেবে বিটকয়েনের ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি জানান, লোকেরা বিটকয়েনকে অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহার করছে, সেটি নিয়ে তিনি খুব ঘাবড়ে গেছেন। ভার্চুয়াল এ মুদ্রার মূল্যটি বিনিয়োগকারীদের চূড়ান্তভাবে অনুধাবন করা উচিত বলেও মনে করেন তিনি।

বিটকয়েনের দাম এ বছর ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে চালু হওয়ার পর এটির দাম বিভিন্ন সময় বেড়েছে ও কমেছে। পরামর্শক সংস্থা কম্পিটিটিভ কমপ্লায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা ইয়ানা আফানাসিভা এটির দামে আগামী মাসগুলোয় আরো উত্থান-পতন হবে বলে প্রত্যাশা করেন।

তিনি বলেন, ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রকৃতিই এমন যে এখানে কিছু ব্যবসায়ী এটিকে কাজে লাগাতে পারেন। তবে এমন কোনো সরকার কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থা

নেই, যারা এটির দামে লাগাম টেনে ধরতে পারেন।

ক্রিপ্টোকরেন্সি লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান কয়েনমেট্রোর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও কেভিন মারকো বলেন, সাধারণত সংকটের সময় মানুষ নগদ অর্থ মজুদ করতে চায়। কিন্তু প্রধান অর্থনীতিগুলো যখন তাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করবে, তখন কে নিজের কাছে প্রচুর অর্থ রাখতে চাইবে? কভিড-১৯ মহামারী, মার্কিন নির্বাচন, ব্রেক্সিট ও সর্বোপরি ২০২০ সাল ডিজিটাল অর্থনীতি নিয়ে পূর্ব ধারণাগুলো ভেঙে দিয়েছে।

এই মূহুর্তে ১ বিটকয়েন = 31786.40 US ডলার বা 2698292.97 টাকা।

- কেন বিটকয়েন নিয়ে জানাচ্ছি আপনাদের?
- কি এর ভবিষ্যত? পেছনের রহস্য কি?

একজন মানুষকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাহলে তার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার লাগাম আপনার হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারবেন।
বিগত ২ পর্বে আপনাদের কাগজের টাকার অসারতা সম্পর্কে বুঝিয়েছি, এই কাগজের টাকা তুলে দিয়ে আগামী দিনগুলোয় "এলিট" রা এই ক্রিপ্টোকারেন্সী তথা ডিজিটাল কারেন্সি স্বরূপ বিটকয়েন চালু করবে যাতে করে মানুষের

অর্থনীতির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। [সেটা আরো বিস্তারিত বুঝবেন পরবর্তী পর্বে RFID chip এর আলোচনায়, ইনশাআল্লাহ] আর দাজ্জালি শাসন ব্যবস্থা তথা "New World Order" এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সারাবিশ্বে একটি একক মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন করা যা হতে যাচ্ছে এই বিটকয়েন ; অর্থাৎ এক সরকার শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যার মূলে থাকবে খোদ দাজ্জাল !

করোনা ভাইরাস যে বানোয়াট তা আপনাদের আগেই বলেছি [পর্ব ২]
এই ভুয়া ভাইরাস এর ভন্ডামিকে কেন্দ্র করে ওরা কিন্তু ওদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলছে যার মাইলফলক ছিল গত ডিসেম্বর যখন বিটকয়েন ইতিহাসের সর্বোচ্চ মূল্যে পৌছে যায়, মহামারীর দোহাইয়ে বিশ্ব অর্থনীতির বিপুল বিপ্লব ঘটিয়ে এক বিশ্বে এক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় একক মুদ্রা/লেনদেন ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর হবে ডিজিটাল কারেন্সি, দাসের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হবে মানবসমাজ।

⭘ **RFID Chip: দাজ্জালের দুনিয়ার চূড়ান্ত দাসত্ব ‼️**

পর্ব ৬ এর ৩টি উপপর্বে অর্থনীতি, মুদ্রাব্যবস্থার পেছনের গল্প-হালচাল-ভবিষ্যত (বিটকয়েন) নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি।
আজকের আলোচনাঃ দাজ্জালি দুনিয়া তথা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের অধীনে প্রতিটি মানুষকে কীভাবে চূড়ান্তভাবে দাসে পরিণত করার বিশাল ষড়যন্ত্র চলছে সেটারই প্রয়াসে নির্মিত "RFID Chip" এর আদ্যোপান্ত ।

◍ RFID CHIP পরিচিতিঃ

"RFID Tag" সাধারণত কোনো বই বা পণ্যের পেছনে দেয়া দেয়া থাকে, যা দিয়ে পণ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়! এখানে, RFID এর পূর্ণরূপ হচ্ছেঃ "Radio Frequency Identification". আপনারা নিশ্চয়ই বারকোড সম্পর্কে অবগত যা রিড করা হয় আলাদা মেশিনের দ্বারা, সেই বারকোড যেমন এক প্রকার ট্যাগ, এই চিপও সেই কন্সেপ্টের তবে ভিন্নতা আছে। এই চিপ এর আকৃতি চালের দানার ন্যায়, এটি একটি ক্ষুদ্র রেডিও ট্রান্সপন্ডার, রেডিও রিসিভার ও ট্রান্সমিটার দ্বারা গঠিত ডিভাইস যা মূলত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাধ্যমে এটাচড বস্তু ট্র্যাক করতে পারে ও সিগনাল পাঠাতে পারে; এটির রিসিভারের

কাছে - উপরন্তু, এটি নির্দেশনা গ্রহণ করে ডিরেকশনও ফলো করতে পারে !

- এটির বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

১. এই চিপ আপনার ভার্চুয়াল মানিব্যাগে পরিণত হবে, আপনার সমস্ত টাকা-পয়সা এই চিপের মধ্যে থাকবে, এর দ্বারা দোকানে-মার্কেটে গিয়ে (ক্যাশলেস) মেশিনের কাছে হাত দিয়েই টাকা লেনদেন করতে পারবেন।

২. আপনার পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি পার্সোনাও ড্যাটাসমূহ সব এই চিপে থাকবে।

৩. আপনি কে? আপনাকে সুর্নিদিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাবে এমন একটা কোড থাকবে আপনার চিপে, দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে আলাদা আলাদাভাবে শনাক্ত করার জন্যই থাকবে এই ব্যবস্থা যাকে " Mark of the Beast" বলে। (666)
[এই ব্যাপারে ভবিষ্যতে ইলুমিনাতি সিরিজে বিস্তারিত বুঝাব ইনশাআল্লাহ]

৪. আপনার স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন এপ্লিকেশন এর সাথে এই চিপ সার্বক্ষনিকভাবে কানেক্টেড থাকবে।

৫. এটায় GPS সিস্টেম একদম বিল্ট-ইন, আপনার সার্বক্ষণিক লোকেশন

সবসময় ট্র্যাক করা হবে ও তা স্টোরে জমা থাকবে ।

৬. আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থাও এটি শনাক্ত করতে পারবে ।

৭. এটি দুই প্রকার। i) Active : এটি ব্যাটারি চালিত, ii) Passive : এটি ব্যাটারি ছাড়াই পরিচালিত এবং এটি RFID Reader থেকে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি আহরণ করে চলে ।

৮. এটির মাধ্যমে আপনার সমস্ত গতিবিধি নজরে রাখা হবে ও আপনার প্রতি মুহুর্তের তথ্য-উপাত্ত ডাটাবেইজ এ সেইভ রাখা হবে ।

৯. ফিউচার টেকনোলজির দ্বারা এতে হিডেন পয়জন থাকবে যার মাধ্যমে ; "উপর" থেকে নির্দেশ আসামাত্র সেই চিপ উক্ত জমানো পয়জন (বিষ) ছেড়ে দিবে ও আপনি মারা যাবেন ।

১০. এক কথায়, ডিজিটাল যুগ বলে চিল্লান না সারাক্ষণ? আপনাকে ডিজিটালি দাস বানিয়ে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত যেন করা যায় তার সব ব্যবস্থা এই চিপে বিদ্যমান থাকবে।

● এটির উদ্দেশ্য ও ভয়াবহতাঃ

পোস্টের একদম শুরুতেই বারকোডের কথা বলেছিলাম যে, এটি একটি ট্যাগ এর ন্যায়, এতদিন বিভিন্ন পণ্যে, বস্তুতে, ডিভাইসে এমনকি পোষা প্রাণীর উপর ব্যবহৃত হয়ে আসছে ।

.

এখন এই চিপ মানবদেহে স্থাপন শুরু হবে। পুরো বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে দাসের ন্যায় নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যেই এটির নির্মাণ। এটির কারণেই মূলত করোনার বানোয়াট কাহিনী বৈশ্বিকভাবে ছড়িয়ে মানুষকে ব্রেইনওয়াশ করা হয়েছে যেন পরবর্তীতে "ওরা" যা-ই বলে তাই যেন চোখে বুঝে মেনে নেই। ওরা বলেছে মাস্ক-স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে, আমরা সবাই করেছি, ওরা বলছে এবার ভ্যাক্সিন নিতে হবে, আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভ্যাক্সিন নেয়ার দিন গিয়ে গুনছি। করোনার দ্বারা লকডাউন এনে বিশ্ব অর্থনীতিতে পরিবর্তন এনে ক্যাশলেস (কাগজের মুদ্রাবিহীন) সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশ্বকে প্রস্তুত করা হচ্ছে যেন ভ্যাক্সিনের সাথেই মানবদেহে এই চিপ স্থাপন করে দেয়া যায়। এক ঢিলে দুই পাখি - স্বাস্থ্যের নিরাপত্তাও নস্ট করতে পারলো, সাথে সাথে আপনার উপর নিয়ন্ত্রণও নেয়া গেলো। এসব ওদের দীর্ঘদিনের সূক্ষ্ম পরিকল্পনার ফসল যা একে একে বাস্তবায়িত হচ্ছে ।

.

ধরুন এটি দেহে স্থাপন করে নিলেন, বিন্দাস লাইফ চলছে। আপনার অজান্তেই

আপনার সমস্ত কার্যক্রম মনিটর করা হচ্ছে ও তা সেইভ রেখে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে যে আপনি সরকার (One World Government) এর বিরুদ্ধে কিছু করছেন কিনা, যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে আপনার চিপটি অকার্যকর করে দেয়া হবে - মূহুর্তের মাঝে আপনার জীবন বরবাদ হবে। সার্ভার থেকে আপনি ব্লক হয়ে যাওয়ায় আপনার সমস্ত টাকা-পয়সা নিমিষেই উধাও হয়ে যাবে। আপনার আইডেন্টিটি ব্লক থাকায় আপনি প্রয়োজনীয় অনেক স্থানে প্রবেশ থেকে বঞ্চিত হবেন। তাছাড়া আপনার লোকেশন ইনফরমেশন তো আছেই - তার জের ধরে যখন তখন আপনাকে তুলে আনা সম্ভব হবে ; আপনার যেখানেই থাকুন না কেন - ছাড় নেই। তুলে আনারও খুব প্রয়োজন পড়বে না - হিডেন পয়জন এক্টিভেট করে দিলেই আপনার জীবন লীলা খতম !

- বর্তমান পরিস্থিতিঃ

পণ্য-ডিভাইসের পর এটি মানবদেহে আরো আগে থেকেই স্থাপন শুরু করা হয়েছে মানুষকে বহুবিধ লোভনীয় সুবিধা দেখিয়ে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে, অফিসে, কর্মক্ষেত্রে এর ব্যবহার দিনে দিনে ট্রেন্ড এ রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে আশার ক্ষীণ আলো হলো কয়েক জায়গায় ইতিমধ্যেই এর বিরুদ্ধে হাক ডাক শুরু হয়েছে [খুবই সামান্য যদিও, যথেষ্ট নয়]

- বাংলাদেশের অবস্থাঃ

বাংলাদেশেও আরএফআইডি চিপ চলে এসেছে! বিশ্বাস হয়না? বাংলাদেশ সরকার আমেরিকার সাথে চুক্তি করেছে ডিজিটাল আইডি অর্থাৎ আরএফআইডি চিপ নিয়ে। এর সাথে ভ্যাক্সিনেরও যোগসূত্র আছে। নীচে লিংক দিয়ে দিয়েছি, দেখে নিবেন! ভাক্সিনের সাথে সাথে সেই চিপ ইমপ্লান্ট করা হবে আমাদের শরীরে। কে ভ্যাক্সিন নিয়েছে আর কে নেয়নি সেটা ট্র্যাক করার জন্য। কি যুক্তি!

বেসরকারী ও সরকারী উভয় খাতের একটি সামান্য অঞ্চল বাংলাদেশে আরএফআইডির বাজার চালাচ্ছে ডেলটেক লিমিটেড। ইতিমধ্যে ডেলটেক লিমিটেড একটি বিশ্বব্যাপী আরএফআইডি সরবরাহকারী বেশ কয়েকটি সংস্থাকে আরএফআইডি বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে। [নীচে লিংক] বাংলাদেশের এপোলো হসপিটাল আরএফআইডি চিপ ইমপ্ল্যান্ট করেছে তার কর্মিদের মধ্যে। তাদের রুটিন, চলাফেরা, টাকা পয়সা, এখন সবকিছুই নজর জারির উপর চলছে। বাহ্, স্বাধীনতা!

- ভবিষ্যতে যে ভয়াবহ দিন আসতে চলেছেঃ

মূলত ভ্যাক্সিনের মাধ্যমেই গোটা বিশ্বের সবাইকে ভবিষ্যতে এটি নিতে দেহে স্থাপনে বাধ্য করা হবে। তবে ভ্যাক্সিন ছাড়াও অনেক জায়গাতেই এটির ব্যবহার চলছে, সেভাবেই চালাবে সামনে। আপনি কোথায় যান, কোথায় থাকেন, কখন

আসেন,কখন যান, কার সাথে উঠাবসা, চলাফেরা করেন, সবকিছুই সরকার ট্র্যাক করতে পারবে! এই চিপ ইমপ্ল্যান্টের পর আপনার জীবন আর আপনার থাকবে না, সরকার অথবা পৃথিবী নিয়ন্ত্রক এলিট'সদের হাতে চলে যাবে! আপনার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

.

সরকার কর্তৃক এটি একটা ফাঁদ - সবার উপর কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। আর সব সরকার মূলত সিক্রেট সোসাইটি (এলিট) দের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত - এসবের একদিম গোড়ায় আছে খোদ দাজ্জাল !

.

বিষয়টা খুব ভয়ানক মনে হচ্ছে না? ! অনেকেই এসবগুলো কথা স্রেফ কন্সপাইরেসি থিওরি বলে উড়িয়ে দেবেন - দেন উড়িয়ে।

.

(যদি আপনি গুগলে এবিষয়ে সার্চ করেন তাহলে একে কন্সপাইরেসি থিওরিই বলবে, গুগল সত্য জানতে দেয় না। তারা চায়-ই আপনাকে বিভ্রান্ত রাখতে, এসব গভীর বিষয়ে ঘাটাঘাটির সময় অবশ্যই সার্চ ইঞ্জিন "DuckDuckGo" ব্যবহার করবেন, ব্রাউজারের সেটিং থেকে চেঞ্জ করে নিয়ে)

.

একদল লোক অন্ধই থাকে যারা অনুধাবনে ব্যর্থ - মিডিয়ার দ্বারা ব্রেইন ওয়াশড। তাদের কাছে এসব হাসির বিষয়। হাসেন ভাই, যখন চুড়ান্ত সময়

এসে পড়বে তখন আর সতর্ক হয়ে কোনো লাভ হবে না। তখন তারাই টিকে থাকবে যারা পূর্বেই সতর্ক হয়েছিল।

.

যদি উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে প্রস্তুত হোন ঈমান বাচানোর যুদ্ধে লড়াইয়ের।

.

আর যদি তা না হয়, তাহলে গোলামী জীবনের অগ্রীম শুভকামনা রইল!

◍ শেষ কথাঃ

এই সিরিজের পূর্ববর্তী পর্বগুলোয় করোনা ভাইরাস-লকডাউন-ভ্যাক্সিনের অসারতা নিয়ে আলোচনা শেষে মুদ্রাব্যবস্থা ও এই চিপ নিয়ে আলোচনা শেষ হলো। আপনি কি জানেন, এর প্রতিটি ঘটনা একটি-অপরটির সাথে কানেক্টেড!

কীভাবে কানেক্টেড? কেন হচ্ছে এসব? মূল উদ্দেশ্য কি? কারা করাচ্ছে? সমাধান কি? - ইত্যাদি আলোচনা করব পরবর্তী পর্বে ; ইনশাআল্লাহ।

.

তখন সব গুলো বিষয় ক্লিয়ার হবে ইনশাআল্লাহ - বুঝবেন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার তথা দাজ্জালি দুনিয়ার ইতিকথা ; এক সরকার শাসন ও এজেন্ডা 21 (Agenda-21) ইত্যাদি সব বিষয় ।

[প্রয়োজনীয় লিংক]

1.
https://www.scirporg./html/2-7800121_30055.htm
2.
https://www.thefinancialexpress.com.bd/sci-tech/man-receives-under-skin-chip-implant-live-at-mobile-show-1551168817
3.
https://www.researchgate.net/publication/276492852_RFID_Applications_Prospects_and_Challenges_in_Bangladesh
4.
https://www.hindustantimes.com/brunch/ready-for-a-microchip-to-control-your-body/story-6ncVS0JawRgGJHOq2YLfZM_amp.html
5.
https://www.atlasrfidstore.com/rfid-insider/active-rfid-vs-passive-rfid

6.

https://www.atlasrfidstore.com/rfid-insider/active-rfid-vs-passive-rfid

7.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification

8.

https://stop5g.cz/us/virus-lockdown-go-cashless-install-5g-rfid-vaccination-id2020/

9.

http://www.howardnema.com/2020/11/29/us-purches-500-million-covid-19-vaccine-syringes-designed-to-inject-microchips/

10.

https://lightonconspiracies.com/rfid-chip-mark-of-the-beast-5g-6g-satellites-emily-elizabeth-windsor-cragg-and-alexandra-jb/

11.

https://www.express.co.uk/news/weird/703856/MARK-OF-THE-BEAST-Secret-plan-to-implant-us-all-with-ID-chips-by-2017

12.

https://www.express.co.uk/news/science/614168/Secret-plan-

inject-ALL-ID-chips-vaccination-program-Simon-Parkes-conspiracy-theory

13.

http://www.conspirazzi.com/category/rfid-chips/

14.

https://www.techopedia.com/definition/24272/rfid-chip

15.

https://thenewamerican.com/will-microchip-implants-in-humans-become-mandatory/

16.

https://www.conspiracyarchive.com/NWO/microchip_implants_mind_control.htm

17.

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/09/how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-microchip/570946/

18.

https://www.pcworld.com/article/260930/technologys_dark_side_devious_devices_designed_to_harm_you.html

19.

https://www.infosecurity-magazine.com/slackspace/microchips-for-humans/
20.
https://www.govtech.com/blogs/lohrmann-on-cybersecurity/chip-implants-the-next-big-privacy-debate.html
21.
https://www.change.org/p/us-government-us-senate-us-congress-us-house-united-nations-stop-human-implantation-of-rfid-microchip
22.
https://medicalfuturist.com/rfid-implant-chip/

RFID Chips Used In Humans
(Chip grano de arroz)
Grain of rice
RFID Chip

ID2020
5G Radiation
Control
Grain of rice
RFID Chip
5G
RFID is connected to 5G
STOP5G.CZ

MICROSOFT AND OTHERS CREATE ID2020 ALLIANCE TO FORCE DIGITAL ID ON ALL - PERHAPS BY VACCINE
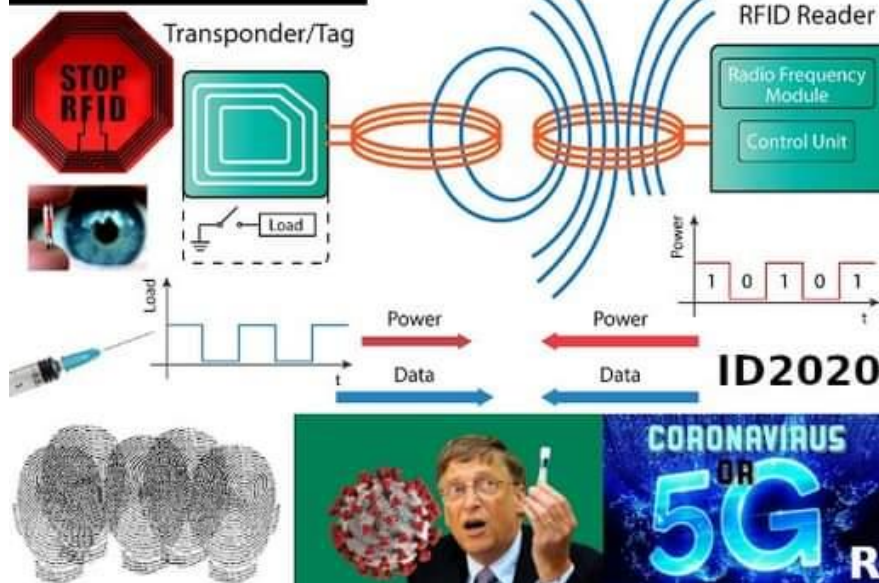
Nano-particles, RFID can be activated by 5G microwaves in the human body, so someone can influence them, control them, change our information field, quantum field or our DNA This is so call "Neural Mesh" or NanoCore network. All data are collected and algorithms are used on them - abused A.I.. Activation of nano-particles can be done via 5G ground stations or via satellites.

পর্ব ৭

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারঃ দাজ্জালের "নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা" ‼️
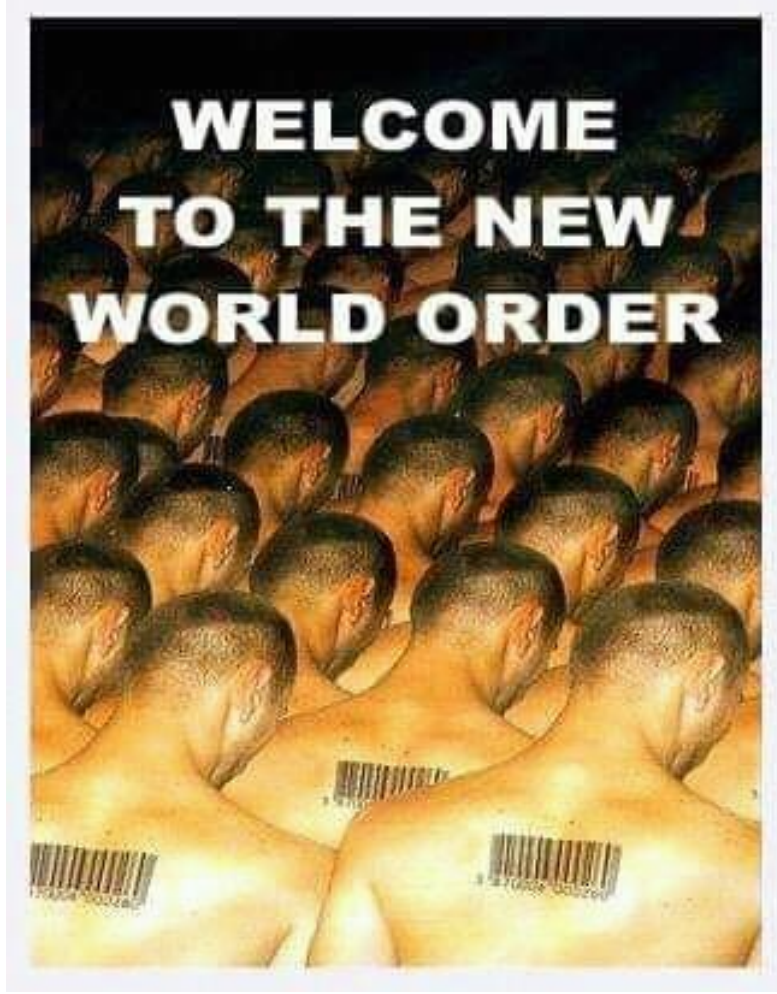
বিগত পর্ব ৪.১+৪.২ এ এনিয়ে কিছু আলোচনা করেছি, আজ আরো কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আসলে, এই বিষয়টা এমন একটি চ্যাপ্টার যা মূলত গভীরভাবে বুঝতে-শিখতে-জানতে বিশদ গবেষণা প্রয়োজন - দীর্ঘদিন ধরে এর পেছনে প্রচুর সময় দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ অনেকটুকুই জানা হয়ে গেছে। সম্পুর্ন বিষয়টা আসলে একক কিছু নয় - চরম গভীর ও অন্যান্য অনেক

বিষয়ের সম্পৃক্ততা এতে বিদ্যমান যেমনঃ সিক্রেট সোসাইটি'স, ইলুমিনাতি, প্রজেক্ট ব্লু বিম ইত্যাদি অনেক কিছু। সবগুলোর যথাযথ আলোচনা ভবিষ্যতে আমার ব্লগে করব ইনশাআল্লাহ। আজ এখানে সংক্ষেপে ঠিক ততটুকুই জানাব যা না জানলেই নয় ও যার দ্বারা পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ার হয় ।

- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার আসলে কি?

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্ব শাসন হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা বা জীবনব্যবস্থা যেখানে একজন অনির্বাচিত রাজা বা সরকার প্রধান (দাজ্জাল) সমগ্র পৃথিবীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে পরিচালনা করবেন। নতুন এই পৃথিবী এক শাসক, এক ধর্ম, এক মুদ্রা, এক আর্মি ও এক আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। নতুন এই বিশ্ব ব্যবস্থায় সকল ব্যক্তিদেরই নিয়ন্ত্রণ করা হবে, হোক সে নারায়ণগঞ্জের কিংবা নিউ ইয়র্কের। তাদের অন্যতম সিম্বল হচ্ছে "All Seeing Eye" কোন কিছুই তাদের আড়ালে হতে পারবে না। সবার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, অধিকার, খাদ্য, পানি, বিবাহ, সন্তান, বাসস্থান, স্বাধীনতা, মুক্তমত এবং অর্থনীতি সহ সকল কিছুই নিয়ন্ত্রণ করা হবে অনেকটা ঈশ্বরের মত করে।

প্রতিটি দেশ চলে সরকারর নিয়ন্ত্রণে, প্রতিটি সরকার মূলত চলে সিক্রেট

সোসাইটিগুলোর অধীনে - আর সবের একদম মূলে অবস্থান করছে দাজ্জাল ।

NWO : New World Order

পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা !!!

এটা এমনই একটা শব্দ যেটা আমেরিকার বিভিন্ন প্রেসিডেন্ট, রাজনৈতিক নেতা সামরিক প্রধান,,অভিজাত ও প্রভাবশালী ব্যাক্তিদের মুখে একাধিক বার শোনা গিয়েছে!! নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার হচ্ছে গোটা বিশ্বকে একটি অভিন্ন জাতি ও অভিন্ন ধর্মতে পরিণত করার মহাপরিকল্পনা।নতুন এই বিশ্ব ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয় কয়েকশ বছর আগে।এখন এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে। বর্তমান জাতিসংঘ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হচ্ছে ঐ পরিকল্পনার বড় ধরণের সাফল্য। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেই পরিকল্পনারই ফল বলেই অনেকে মনে করেন।বিশেষ করে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে,ফলে তারা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় স্বস্তি পায়।।জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সবকটি রাষ্ট্রকে আয়ত্তে আনা হয়। ঠিক একই ভাবে ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে শান্তি স্থাপনের নাম করে One World Government বা New World Order প্রতিষ্ঠা করা হবে। একটি সভায় ডেভিড রকফেলার বলেন: "আমরা একটি বিশ্বব্যাপী রূপান্তরের শেষপ্রান্তে, এখন আমদের শুধু একটি major crisis দরকার যাতে

সমস্ত জাতি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার গ্রহণ করে।" প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর "ভিক্টরি উইদাউট ওয়ার" নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকা সমগ্র বিশ্বের শাসকে পরিণত হবে এবং এই বিজয় তারা যুদ্ধ ছাড়াই অর্জন করবে। তারপর মাসিহ (দাজ্জাল) নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিবেন। যেন উল্লেখিত সন পর্যন্ত মাসিহর সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়ে যাবে আর আমেরিকার দায়িত্ব এসব ব্যবস্থাপনাকে সম্পন্ন করা পর্যন্ত। তারপর মাসিহ রাজ্য পরিচালনা করবে।

- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর উদ্দেশ্য ?

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বকে দাসত্বে আবদ্ধ করে রাখা। সারা বিশ্বে কয়েক হাজার গুপ্ত সংস্থা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। (ইলুমিনাতি তার একটি) এদের লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবী থেকে সমস্ত ধরণের সরকার উচ্ছেদ করা, সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, স্বদেশপ্রেম ধ্বংস করা, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করা, সকল প্রকার ধর্মের বিনাশ করা এবং একটি One World Government তৈরি করা। নতুন এই বিশ্ব ব্যবস্থার নাগরিক হতে হলে শয়তান কে ঈশ্বর হিসেবে মানতে হবে। David Spangler, Director of Planetary Initiative, United

Nations stated that "No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer". শয়তান সমগ্র বিশ্বকে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসন করতে চায়। যারা এই শাসনব্যবস্থা মেনে নিবে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে আর যারা মানবে না তাদেরকে খাদ্য, পানি, অর্থনৈতিক অবরোধ ও যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কিভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব ?

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে যদি ১০ টি ধাপে ভাগ করা হয় তাহলে বলব এর ৯ টি ধাপই সম্পন্ন হয়ে গেছে। তারা Secularism(ধর্মনিরপেক্ষতা), Communism (সাম্যবাদ), Humanism (মানবধর্ম), Atheism(নাস্তিকতা), Materialism(বস্তুবাদ) ইত্যাফি ব্যবহার করে ধর্ম কে মানবতা ও বিজ্ঞানের শত্রু বানিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি ও দুঃশাসনের মাধ্যমে যৌনতা, সমকামিতা ও নৈতিক অধঃপতন ঘটানো হয়েছে। তারা সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের নামে ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা একটা একক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছে এখন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়নের জন্য এখন শুধুমাত্র একটি crisis দরকার যাতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে শান্তি স্থাপনের নামে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়ন করা যায়। অন্য ধর্ম গুলো যেমন খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্ম NWO এর কাছে আগেই পরাজিত হয়েছে, এখন তাদের পথের একমাত্র বাধা হচ্ছে ইসলাম।

- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কি সফল হবে?

২য় বিশ্বযুদ্ধে ৮ কোটি লোক হত্যা করা হয়েছিলো। তারা এখন আরেকটা বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে কমপক্ষে ২০০ কোটি লোক হত্যা করতে চায়, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে জনসংখ্যা সীমিত রাখা হবে। প্রযুক্তির কল্যাণ আর অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা সফলকাম হবে। যদি বাংলাদেশের দিকে তাকায় তাহলে দেখা যাবে, বাংলাদেশ সেকুলার হয়ে গেছে, বায়োমেট্রিক ফেসবুক টুইটারের মাধ্যমে সবার উপর নজর রাখা হচ্ছে, মাইন্ড কন্ট্রোলের মাধ্যমে তাদের ব্রেইন কে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে যৌনতা ছড়ানো হয়েছে, সবাইকে বস্তুবাদী করে ইলিউসনের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। এমন অবস্থায় তাদের পরাজিত করে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়ন খুব সহজ হয়ে গেছে।

- বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে NWO :

একটি দেশ যেমন তাগুত সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় - তেমনি গোটা বিশ্বকে এক সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করাই হলো নতুন বিশ্ব শাসন ব্যবস্থা। একে আবার "OWO : One World Order" ও বলা হয়। তো এ শাসনব্যবস্থা কায়েমে বিশাল এক মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে করোনা ভাইরাস ; যা সম্পর্কে একদম শুরু থেকেই আপনাদের সতর্ক করে আসছি ।

.

করোনা ভাইরাসের মিথ্যা-বানোয়াট ভুগিচুগি মার্কা মিডিয়ার সব কারসাজি হলো মূলত এই দাজ্জালি শাসনের প্ল্যানিং এরই অন্তর্ভুক্ত ছিল - যেন ধীরে ধীরে সবাইকে দাসে পরিণত করা যায়। মিডিয়ার ব্রেইনওয়াশিং প্রপাগান্ডার কারণে সবাই এখন লকডাউন মেনে নিয়ে মাস্ক-স্যানিটাইজার ব্যবহার শুরু করে ভ্যাক্সিন নিতে আগ্রহী হয়ে গেছে (just like slaves!!!) অতঃপর আসবে চিপের খেলা! প্রতিটা পয়েন্ট নিয়ে সিরিজের বাকি পর্বগুলোয় আলোচনা করেছি, আশা করি এখন বিষয়গুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে।

Illuminati
New World Order

THE
ILLUMINATI
AND THE ONE
WORLD GOVERNMENT

"The world has 6.8 billion people...
that's headed up to about 9 billion.
Now if we do a really great
job on new vaccines,
health care, reproductive
health services, we could
lower that by perhaps
10 to 15 percent."
- Bill Gates
Microsoft, Globalist,
Member of Bilderberg Group

SECRETS
OF
AGENDA 21
AGENDA21
FEMA CAMPS-OUR FUTURE!!
WAKE UP!
AI
CAUTION
NEW WORLD ORDER
AHEAD
POTENTIAL HAZARDS INCLUDE
AGENDA
2030
5G
WARNING
MICROWAVE
HAZARD
IN THIS AREA
GOVERNMENT
CENSORSHIP
PROTECTING YOU FROM REALITY
THE
VIRUS
AND THE VACCINE

BILL & MELINDA GATES foundation

পর্ব ৮

Activation Programme of NWO : AGENDA 21 + AGENDA 2030

দাজ্জালি বিশ্বশাসন ব্যবস্থা (নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার) যার বাস্তবায়নকে ঘিরে কাফির বিশ্বের আপ্রাণ সব প্রচেস্টা - বিগত পর্বে আপনাদের সেটার কন্সেপ্ট জানিয়েছি। আজ জানাব সেই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর প্ল্যানিং সম্পর্কে। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কাফির সম্প্রদায় সবসময়ই প্ল্যানিং এর মাধ্যমে কাজ করে আসছে - দাজ্জালের জন্য পৃথিবীটা প্রস্তুত করতে তারা নেক সুরতে আমাদের ধোঁকা দিয়ে উপরে উপরে একটা দেখায় ও তলে তলে আকাম চালিয়ে যায় - সেসবেরই মাস্টার প্ল্যানিং হচ্ছে এজেন্ডা 21 ও এজেন্ডা 2030 ।

আজকের আলোচনা এবিষয়েই।

- Agenda 21 ও Agenda 2030 আসলে কি?

এজেন্ডা ২১ হল একটি প্রোগ্রাম যা জাতিসংঘ বাস্তবায়ন করতে চায়। আজ থেকে ২৮ বছর আগে ১৯৯২ সালে ইউনাইটেড ন্যাশন্সের (UN) একটি কনফারেন্সে earth summit এর AGENDA 21 নামে একটি এ্যকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন করে ব্রাজিলের রিও দে জেনেরিও তে। প্রকল্পনার মূল লক্ষ্য sustainable development. শুনতে মধুর শোনালেও এর এ্যকশন প্ল্যানের একটি হলো পপুলেশন কন্ট্রোল বা ডিপপুলেশন। আমি নিচে অফিশিয়াল সাইট, অফিশিয়াল পিডিএফ বইয়ের লিংক দিয়ে রেখেছি - "কন্সপাইরেসি থিওরি" বলে চালান দেয়ার বিন্দুমাত্র উপায় নেই।

.

২০২১ সালে তারা অনেকটাই সফল হতে পারলেও পুরোপুরি হয়নি বলে সেটাকে দীর্ঘ করে Agenda 2030 নাম দিয়ে ২০৩০ সাল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে।

- উদ্দেশ্যঃ

এজেন্ডা ২১ এর উদ্দেশ্য হিসেবে অনেক কিছুই বলা রয়েছে। যেখানে রয়েছে ব্যক্তিগত ঘর বিলোপ করে শহরকেন্দ্রিক আবাসন ঘরে তোলা। অর্থাৎ একটি ফ্ল্যাট বা এপার্টমেন্ট দেয়া হবে সবাইকে। আর এসব স্থানে নিয়ন্ত্রন থাকবে

দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের। যার অর্থ, ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রন করা হবে। এছাড়া শুল্ক বা ট্যাক্স বাড়ানো, সেই সাথে কঠোর আইন প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ ও এজেন্ডা ২১ এর উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে, ইত্যাদি অনেক টারগেট তাদের, সব গুলো খুলে বললে খুব বেশি বড় হবে পোস্ট, আর সব জানার প্রয়োজনও নেই, তাই আমি তাদের একদম মূল উদ্দেশ্য নিয়েই আলোচনা করব যা হলো জনসংখ্যা হ্রাস করা। এ অনুসারে জাতিসংঘ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন বা নিয়ম অনুসারে বিশ্বের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন করতে চাচ্ছে। নেক সুরতে ধোঁকা বা প্রতারণার মাস্টারপিস হলো এসব এজেন্ডা। মিথ্যা কত সুন্দর করে বলে মানুষকে ফাঁদে ফেলে ব্রেইনওয়াশ করা যায় - সেসবের বস শয়তানের হাড্ডি হলো এরা। তারা এত সুন্দরভাবে বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করেছে যে পেছনের রহস্য বোঝা সহজ নয় (ঈমানের বলের সামনে যদিও এসব কিছুই না) মনে হবে যেন, দ্রুতই বিশ্বে শান্তি ফিরিয়ে আনবে তথাকথিত মানবতার এই দূতেরা। (রিমেম্বার, দাজ্জালও কিন্তু শান্তির দূত হিসেবেই আবির্ভাব করবে - তারই জন্য এত হাঙ্গামা)

- ডিপপুলেশন এজেন্ডাঃ

জাতিসংঘের মতে বিশ্বে মানুষের সংখ্যা বেশি। এত মানুষের “প্রয়োজন” নেই বিশ্বে। এসব মানুষ বরং বিশ্বের ক্ষতি করছে। এসব “অপ্রয়োজনীয়” নবায়ন অযোগ্য সম্পদ যেমন অক্সিজেন পেট্রোল ইত্যাদি নষ্ট করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে

কোন মানুষদের এ বিশ্বে প্রয়োজন নেই? ধনীদের? না গরীবদের?
CNN এর প্রতিষ্ঠাতা, মিলিয়নেয়ার টেড টারনার (Ted Turner) নিজের একাধিক সাক্ষাতকার বা বক্তৃতা তে বৈশ্বিক উষ্ণতার (Global Warming) জন্য অধিক জনসংখ্যা কে দায়ী করেছেন। তার মতে বেশি মানুষ বেশি সম্পদ ব্যবহার করছে! মানুষ কম হলে কম সম্পদ ব্যবহৃত হবে। যার ফলস্বরূপ বৈশ্বিক উষ্ণতা হবে না! এমন কি রিক ওয়াল্টম্যান (Rick Oltman)। যিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, তিনিও জনসংখ্যা কমানোর কথা বলেছেন। উনি মনে করেন এত জনসংখ্যা মানুষের জীবন মান কমিয়ে দিয়েছে।অনেকের মতে এজেন্ডা ২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের ৯৫ শতাংশ জনসংখ্যা হ্রাস করা হবে। তাদের টারগেট অপ্রয়োজনীয় মানুষদের মেরে ফেলা। বর্তমান বিশ্বের শুধু ৫-১০ শতাংশ মানুষদের শুধু প্রয়োজন। বাকি ৯০ শতাংশ মানুষ বিশ্বের অধিকাংশ নবায়নযোগ্য সম্পদ ধ্বংস করছে যার উপর বাকি ১০ শতাংশের অধিকার। এমনকি মার্কিন রাজনীতিবিদ হেনরি কিসিঞ্জার ও ডিপপুলেশন এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

এখন প্রশ্ন হল এই ডিপপুলেশন বা জনসংখ্যা হ্রাস হবে কিভাবে? এখানে ২ টি উপায় রয়েছে। এগুলো হল, ১. খাদ্যের মাধ্যমে ২. স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে। এখন যখনি স্বাস্থ্যসেবা ও এজেন্ডা ২১ এর প্রসঙ্গ আসে, চলে আসে বিল গেটস এর নাম। বিল গেটস বিশ্বে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি এটা হয়ত আমরা সবাই জানি।

কিন্তু এটা হয়ত অনেকেই জানি না যে, ২০১১ সালে বিল গেটস একটি পোলিও টিকা ক্যাম্পেইন চালান। যার কারনে প্রচুর শিশু আক্রান্ত হয় এবং অনেক শিশু মারাও যায়। বিল গেটস এর উপর ৩০০০০ শিশুর ওপর বেআইনি ভাবে টিকার পরীক্ষন করার অভিযোগ ও রয়েছে। প্রশ্ন হলো বিল গেটস এসব কেন করছেন?

আমরা অনেকেই জানি বিল গেটসের নিজস্ব একটি সংস্থা রয়েছে। যার নাম মিলেন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন (Melinda Gates Foundation). এই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন রোগের টিকা বানায় এবং তাদের পরীক্ষন করে। এমন একটি পরীক্ষনের জন্যই তাদের বিভিন্ন বার আদালতেও যেতে হয়। বিল গেটস ডিপপুলেশন বা জনসংখ্যা হ্রাসের নীতিতে বিশ্বাসি। উনার টেড টক্স (Ted Talks) এর একটি বক্তৃতা চলাকালীন সময় তিনি একমাত্র জনসংখ্যা কে বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ি করেন। আর এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় হিসেবে জনসংখ্যা কমানোর কথা বলেন।

অথচ বৈশ্বিক উষ্ণতার সবচেয়ে বড় কারন হল কল-কারখানা বা মটর যান থেকে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড। এই নীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মতে কল-কারখানা বা মোটরযান নয়, একমাত্র মানুষ-ই বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ি। বিল গেটস সেই বক্তৃতা তে ভ্যাক্সিন বা টিকা তৈরী করে জনসংখ্যা কমানোর

জন্য ব্যবস্থা নেয়ার কথাও বলেছেন। এমনকি বিল গেটস নিজেও বিভিন্ন সাক্ষাতকারে স্বীকার করেছেন যে তাদের বানানো ভ্যাক্সিন বা টিকা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে কাজ করছে। যদিও কোথাও তিনি ভ্যাক্সিনের মাধ্যমের শিশুদের হত্যার কথা বলেন নি ।

এভাবে বিল গেটসও এজেন্ডা ২১ এর বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন। এখন এজেন্ডা ২১ কে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার কথা ছিল ২০২০/২০২১ সাল নাগাদ। কিন্তু তা সম্ভব হবে না বিধায় ২০৩০ সাল নাগাদ পরিকল্পনা টি বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়েছে। আর এর নাম দেয়া হয়েছে এজেন্ডা ২০৩০।

কি? মনে হচ্ছে কথাগুলো অপ্রাসঙ্গিক? মনে হচ্ছে এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়? তাহলে ইন্টারনেটে খুজে দেখতে পারেন। সার্চ করুন “agenda 2030 Babgladesh” যে অফিসিয়াল পেজটি পাবেন সেখাটি খুললেই দেখতে পাবেন এজেন্ডা ২০৩০ এর উদ্দেশ্য গুলি। টাইলস আকারে লেখা প্রতিটি লক্ষ্যের সাথে একটি চিত্র বা লোগো আকা আছে। যার অনেক গুলোই হল ইলুমিনাতির প্রচলিত লোগো বা চিহ্ন সমূহের অনুরূপ। চিহ্নগুলো হলো চোখ, সূর্য সহ আরো অনেক কিছু ।

স্যাটানিক সিক্রেট সোসাইটির অধীনের পরিকল্পনায়, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর অন্যতম সবচেয়ে বড় টারগেট হলো জনসংখ্যা প্রচুর কমিয়ে আনা - সেই লক্ষ্যেই মূলত ভ্যাক্সিন দিয়ে দিয়ে মানুষ মারা হয়, দুর্বল করা হয়, জীবন নস্ট করা হয়, এতদিন বাধ্যতামূলক ছিল বটে তবে এবারের ভ্যাক্সিন হবে সবচেয়ে ভয়ানক, এটি হবে প্রথম স্টেজ - সবাইকে জোর করে বিষ গেলানোর, ২য় স্টেজ হবে চিপ বসানোর। অনেকক্ষেত্রে দুটো একত্রেই বাস্তবায়িত করবে (করছেও ইতিমধ্যেই)।
জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে পারলেই তো আধিপত্য প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ হবে!

জাতিসংঘের এজেন্ডা 21 এর অধীনে মূল পরিকল্পনা হলো মৃত্যুর মাধ্যমে ২০২০ সাল নাগাদ বিশ্বের 7 বিলিয়ন থেকে ৫০০ মিলিয়ন জনসংখ্যা কমানো। আমেরিকান জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে 2030 সাল নাগাদ 320 মিলিয়ন থেকে 20 মিলিয়ন । যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা 2015 হিসেবে 64 মিলিয়ন ২০২২ সালের মধ্যে কমিয়ে ১৯ মিলিয়নে নামিয়ে আনতে হবে। করোনা নামক ভাইরাস সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হলো পৃথিবী থেকে মানুষ কমানো। একক বিশ্ব সরকার ব্যবস্থার WEF এর "গ্রেট রিসেট" এবং জাতিসংঘের "বিল্ড ব্যাক বেটার" পরিকল্পনা ও এজেন্ডা 21 এবং 2030 একসাথে চলেছে । অর্থাত এজেন্ডা 21 হলো পরিকল্পিত ভাবে মানুষ হত্যা করে জনসংখ্যা হ্রাস করা, আর এজেন্ডা 2030 হলো করোনা ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে মানুষের শরীরের ভেতর চীপ

বসানো । এই চীপ 5 জি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষ কে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। পাশাপাশি এই ভ্যাকসিন মানুষের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস করবে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতে থাকবে। আর এই পরিকল্পনার সাথে জড়িত সদস্য দেশগুলির প্রধান পরিসংখ্যানবিদরা প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার জন্য ২ টি সূচক রাখার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক দশকের উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল ,যা বাস্তবায়নের জন্য 2020 সালে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়া হয়। [মিথ্যা প্রোপাগান্ডা] এই এজেন্ডার মাধ্যমে তারা পুরো পৃথিবীর অর্থনীতি, আমাদের দেশ, আমাদের জীবন এবং আমাদের শিশুদের সহ পুরো পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছে।

- বিশ্ব (অ)স্বাস্থ্য সংস্থার স্পষ্ট শয়তানিঃ

পপুলেশন এর কথা বলতে গেলেই চলে আসে WHO এর নাম। কারন WHO ই সেন্টার স্টেজ হিসেবে কাজ করছে। বিশ্বের সকল স্বাস্থ্য সংস্থা তাকে মানতে বাধ্য। তারা বলে পৃথিবীর জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে চলছে, আমাদের কিছু নির্দিষ্টসংখ্যক লোকজন ছাড়া সাধারন মানুষের বেচে থাকার দরকার নাই। তারা শুধু সম্পদ, পরিবেশ ক্ষয় করছে,অভাব বৃদ্ধি করছে। (টেড টার্নার, বিল গেটস, হেনরি কিসিঞ্জার, রকফেলার ফ্যামিলিদের মূল কথা) এই WHO মেইন ফান্ডার বিল গেটস যে থার্ড ওয়ার্ল্ড(বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, আফ্রিকা মহাদেশ) এর দেশগুলোতে সে বিভিন্ন ভ্যাক্সিন, টিকার নাম দিয়ে

হাজার জীবন ছিনিয়ে নিচ্ছে, এবনর্মাল করছে আর গিনিপিগের নামে জীবন শেষ করছে। সে নিজেও বলে "vaccine can help us to reduce population."

WHO এর অন্যতম দুটি ফান্ডারের পদই বিল গেটসের দখলে, সে এবং অন্যটি হলো তারই অধীনস্ত GAVI - GLOBAL ALLIANCE for VACCINE IMMUNITY. স্বভাবতই WHO অনেকতা তার মতই কাজ করবে। মূলত তাদের সবার লক্ষ্যই এক, ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠার নামে দাজ্জাল আসার পথ সুগম করা, এটাই তাদের চাওয়া। বিস্তারিত দেখুন, তারা সরাসরি বলছেঃ [1]

WHO এর সাপের লোগোটাও বিষ্ময়কর। সাপ আর লাঠি। এটি "এসক্লেপিয়াস এর লাঠি" বা Rod Of Asclepius নামে পরিচিত। গ্রীক মিথলজির আরেক দেবতা এসক্লেপিয়াস এর প্রতীক এটি। এসক্লেপিয়াস ছিলেন দেবতা এপোলোর ছেলে। এপোলো ছিলেন দেবতা জিউস এর ছেলে। এসক্লেপিয়াস কে রোগ সারানোর দেবতা বলা হয়।বিশ্বাস করা হয় তিনি মৃতকেও জীবিত করতে পারতেন। তার সাইম্বল ছিল একটি লাঠি ও একটি সাপ। অনেকে ক্যাডুসিয়াসের দুটি সাপের সাথে গুলিয়ে ফেলে, এরপর ভুল ভ্রান্তিতে তাও মেডিকেলের লোগোতে চলে আসে। ক্যাডুসিয়াস হল জিউসের আরেক ছেলে হার্মিসের প্রতীক।যাকে দেবতা বলা হত আবার দেবতা ও মানুষের মাঝে বার্তাবাহকও বলা হত। দেখুন [2]

এছাড়াও টিকা নিয়ে ৫পর্বে বিস্তারিত অনেক বলেছি।

- ডিজিটাল আইডিঃ

WHO এখন জোর দিয়ে বলছে একমাত্র সলুশ্যন ভ্যাক্সিন। বিল গেটস এ নিয়ে উঠেপরে লেগেছে। ভ্যাক্সিন তৈরি ছাড়াও সে সবার মাঝে digital id/digital database স্থাপন করতে চায়, যেন বুঝতে পারে সকলেই ভ্যাক্সিনেটেড হয়েছে কিনা। দেখুন [3]

২০১৫ সালে বিলগেটস মহামারীতে ভ্যাক্সিন প্রসারের চিন্তা করছিল [4]

ডিজিটাল সার্টিফিকেটের এই কন্সেপ্টটি যেখানে মেডিক্যাল ইনফরমেশন জমা থাকবে, যা ছিল সেই ২০১৬ সালে UN, রকফেলার ফ্যামিলি(ইলুমিনাটি সংঘঠন), বিল গেটস মাইক্রোসফট এর একটি বিশাল প্রজেক্ট। যার নাম ছিল ID2020. ২০১৬ সালের প্রজেক্টে ভবিষ্যৎ ২০২০ সালের পরিকল্পনা মিলে গেল! ২০২০ এই বাস্তবায়ন এর ডাক আসলো!! আবার ২০২১ সাল আসতেই (প্ল্যান মোতাবেক) ভ্যাক্সিন নিয়ে তোরজোর শুরু হলো! Coincidence??? Nope!!!

ডিজিটাল এই আইডি যা Global database এর কাজ করবে। WHO, BILL GATES আসলে ভ্যাক্সিনেশন চায় না। বরং ভ্যাক্সিনকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে মানবদেহে RFID / Computer chip স্থাপন করতে চায়। বাংলাদেশেও তারা এ digital id পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে।

A2i and its partners Gavi and ID2020 are committed to jointly researching and implementing a unique ID for infants through digitisation of vaccination processes in Bangladesh.

The program will provide infants and children with a portable, biometrically-linked digital ID either at the point of birth registration or at the time of their immunizations.In this Bangladesh experiment, digital ID is "biometrically-linked", meaning that it is based on the fingerprints of individuals

দেখুন : [5]

আমাদের দেশেও বায়োমেট্রিক্যালি কাজ চলে। তবে ID2020 চায় এতে ব্যবহৃত স্ক্যানার যেন মিনিমাম FBI সার্টিফাইড FAP30 হয়। তখন শুধু বাংলাদেশ না, আমেরিকাও আপনার ওপর নজরদারি রাখতে পারবে।

অন্যদিকে MIT রিসার্চারস Quantum dot tatto এর ব্যাপারে একটি স্টাডি পাব্লিশ করে, যা ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে দেহে ঢুকানো হবে, নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুযায়ী সূক্ষ্ম কোয়ান্টাম ডটে অর্ধপরিবাহী ক্রিস্টাল থাকবে যা ইনফ্রারেড রশ্মির নিচে জ্বলে উঠবে অদৃশ্য এই কোয়ান্টাম ডট ট্যাটুঃ The pattern — and vaccine — gets delivered into the skin using hi-tech dissolvable microneedles made of a mixture of polymers and sugar.

"It's possible someday that this 'invisible' approach could create new possibilities for data storage, biosensing, and vaccine applications that could improve how medical care is provided, particularly in the developing world," MIT professor and senior author Robert Langer said in the statement.

পর্ব ৬.৪ এ RFID Chip নিয়ে ইউনিক আলোচনা করেছি, বিধায় এখানে এর বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন - প্ল্যানিং এর অংশ হওয়ায় আইডি২০২০ নিয়ে কিছুটা বলা লাগলো।

আরেকটি কথা, বিল গেটস নিয়ে এখানে অনেক বলেছি কেননা এর পক্ষে

অনেক রেফারেন্স আপনারা খুজলে পাবেন, তবে এর বিরুদ্ধেও অনেক পাবেন, কারণ আছে।
সিক্রেট সোসাইটি গুলো খুবই চতুরতার সাথে কাজ করে, তারা যাকে ইচ্ছা সামনে আনে, যাকে ইচ্ছা পর্দার আড়ালে রাখে, ব্যাপারটা এমন নয় যে বিল গেটস-ই এসব ঘটাচ্ছে, সে সামান্য এক চ্যালা মাত্র যাকে প্রফেশনালি সামনে আনা হয়েছে সূক্ষ্মভাবে। তলে তলে আকাম আরো অনেক গভীর...

- শেষ [মূল] কথাঃ

সর্বোপরি, এই এজেন্ডাগুলো মূলত নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর বাস্তবায়নের পরিকল্পনা সমূহ - এতদিনে এই সিরিজে মূলত সেইসব পয়েন্টের কথাই একে-একে শুরু থেকে বলেছি আপনাদের। এজেন্ডাগুলো সুবিশাল - গভীর গবেষণার বিষয়, আমি এই পোস্টে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটা এনেছি যা হলো ডিপপুলেশন, এই ডিপপুলেশনই হলো মূলত করোনা ভাইরাস প্রোপাগান্ডার মূল কারণ । যেন এই বানোয়াট ভাইরাসের নাম করে অর্থনীতি দূর্বল দেখিয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি আনা, লকডাউন ফালানো, সবার মাঝে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সবাইকে ব্রেইনওয়াশ বানিয়ে ভ্যাক্সিন নিতে বাধ্য করা, দুর্বল করা, মেরে ফেলা - জনসংখ্যা তথা মুসলিম কমানো - চিপ বসানোর মাধ্যমে সবাইকে নিয়ন্ত্রণে আনা। ইত্যাদি সবই হচ্ছে মাস্টারপ্ল্যানিং যার পিছে যুগ যুগ ধরে তারা কাজ করে আসছে, আমরা ঘুমিয়ে থাকায় ; অজ্ঞ থাকায় এসব

গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে গাফেল থাকি, আর যারা আমাদের এসব জানায় তাদের মুখ ভরে গালি দিয়ে নিজের মূর্খামির পরিচয় সগর্বে জানান দেই - এইত জীবন আমাদের, বিন্দাস লাইফ, না?

সিরিজের ১৯তম পর্ব ছিল এটি, মূল সব কিছু বলা শেষ, I repeat, মূল সব কিছু, যেমন ধরুন আজকের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য জানিয়ে শেষে উপসংহারে এসে সব বিষয় মিলিয়ে বললাম, প্রকৃতপক্ষে চক্রান্ত অনেক গভীর, অত কিছু সহজে বুঝে আসবে না, এসবই বুঝে না অধিকাংশ, তাই সব কিছুর মেইন কথাগুলোই বললাম। আগ্রহীদের জন্য নিচে প্রচুর লিংক দিয়ে রেখেছি।

ওহ্ আরেকটা কথা, স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত জনতাকে বিমুগ্ধ করে রাখা হয়েছে যে ভিশন 21 এর দ্বারা, তা মূলত এই এজেন্ডা 21 এরই অপর নাম ছিল, নাইস প্র্যাংক, তাইনা?

এটাই সাইন্স 🙂🤣🙂

আর মূলত এই এজেন্ডার জন্যই সিরিজটার নাম দিয়েছিলাম ২০২১ সালের ভয়াবহতা, নাহলে আসন্ন দিনগুলোর ভয়াবহতা নামটাই সর্বাধিক উপযুক্ত ছিল, কেননা এখানের সব কিছুই এবছরের মধ্যে সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে না

ইনশাআল্লাহ, রব আমাদের হেফাজত করুক ।

রেফারেন্সঃ

[1] https://youtu.be/SphwUasSMJI

https://youtu.be/_PUKd-DV1w0

https://www.snopes.com/.../bill-gates-vaccinations-depopulat.../

[2] https://www.bigganbangla.com/greek-mythology-in-medical-sy.../

[3] https://vigilantcitizen,com/.../the-true-agenda-of-the-who-a.../

[4] https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI

[5] https://vigilantcitizen.com/.../bill-gates-calls-for-a-digit.../ (শেষের দিকে)

https://www.biometricupdate.com/.../id2020-and-partners-launc... [লাস্টে আবার কন্সপাইরেসি থিওরিস্টদের উদ্দেশ্যেও বলসে 🤣]

[প্রয়োজনীয় লিংক]

 Official Sites :

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

[Agenda 21 - Official PDF download]

https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals

[Agenda 2030 - Official PDF download]

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

https://sdgs.un.org/2030agenda

[সবাইকে ভ্যাক্সিন দেয়ার অফিশিয়াল বাধ্যতামূলক প্ল্যানিং]

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/ia2030

https://www.un.org/humansecurity/agenda-2030/

[বাংলাদেশে]

https://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/banglade/natur.htm

- Expose Links of Agenda 21 & Agenda 2030 :

https://911nwo.com/?p=8895

https://realverifiednews.com/agenda-21-united-nations-new-world-order/

https://steverotter.com/agenda-21-and-agenda-2030-new-world-order/

https://www.investmentwatchblog.com/agenda-21-or-agenda-2030-the-plan-to-kill-you-the-united-nations-depopulation-plan-the-global-cabal-of-the-u-n-agenda-21-is-behind-global-warming-regionalism-zoning-land-and-water/

https://coldcast.org/pages/agenda21exposed

https://www.howardnema.com/2020/03/15/un-agenda-21-collectivist-scam-exposed/

https://therealtruthnetworkcom.wordpress.com/2020/06/28/agenda-21-nwo/

https://www.glennbeck.com/theblaze-tv/exposed-governments-

using-the-coronavirus-pandemic-to-finalize-agenda-21-social-planning-revolution

https://www.cancerwisdom.net/agenda-21-depopulation/

https://www.glennbeck.com/theblaze-tv/exposed-governments-using-the-coronavirus-pandemic-to-finalize-agenda-21-social-planning-revolution

https://www.theblaze.com/shows/glenn-tv/agenda-21-pandemic

http://finalwakeupcall.info/en/2015/10/21/agenda-21-converted-into-2030/

https://globalpossibilities.org/the-united-nations-2030-agenda-decoded-its-a-blueprint-for-the-global-enslavement-of-humanity-under-the-boot-of-corporate-masters/

https://www.cuttingedgechristianity.com/religionspirituality/agen

da-2030-preparing-the-way-for-the-antichrist-the-new-world-order/

https://cairnsnews.org/2019/04/18/you-will-be-micro-chipped-by-2030/

https://www.endtime.com/articles-endtime-magazine/the-true-agenda/

https://leohohmann.com/2020/04/15/globalists-using-covid-19-to-usher-in-un-agenda-2030-brave-new-world-ten-years-ahead-of-schedule/

https://deceptionbyomission.com/un-deception/uns-inventory-and-control-plan-for-the-new-world-order-agenda-2030-exposed/

https://www.truthandaction.org/uns-agenda-2030-true-objectives-behind-new-sustainable-development-goals/

WHAT IS AGENDA 2030?

On 1 January 2016, the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable Development — adopted by world leaders in September 2015 at an historic UN Summit — officially came into force. Over the next fifteen years, with these new Goals that universally apply to all, countries will mobilize efforts to end all forms of poverty, fight inequalities and tackle climate change, while ensuring that no one is left behind.

The SDGs, also known as Global Goals, build on the success of the Millennium Development Goals (MDGs) and aim to go further to end all forms of poverty. The new Goals are unique in that they call for action by all countries, poor, rich and middle-income to promote prosperity while protecting the planet. They recognize that ending poverty must go hand-in-hand with strategies that build economic growth and addresses a range of social needs including education, health, social protection, and job opportunities, while tackling climate change and environmental protection.

Source –

ALL OF WHAT WE SEE HAPPENING IN THE WORLD IS PART OF GREATER PLANS CALLED THE AGENDA 21, AGENDA 2030 AND VISION 2050.
THESE ARE THE UNITED NATIONS PLANS TO DEPOPULATE THE PLANET FROM 7.5 BILLION DOWN TO 500 MILLION AND RULE HUMANITY UNDER A COMMUNIST ONE WORLD GOVERNMENT IN THE YEAR 2030. THIS IS WHAT THE GLOBALISTS WANT, AND IT'S EXACTLY WHAT THE NATIONAL SOCIALISTS WARNED US ABOUT AND TRIED TO PREVENT.

THE GLOBALISTS WANT TO:
• ABOLISH PATRIOTISM/NATIONALISM.
• ABOLISH ALL PRIVATE PROPERTY.
• ABOLISH INHERITANCE LAW AND THE RIGHT TO BEAR ARMS.
• ABOLISH THE NUCLEAR FAMILY.
• DESTROY THE NATION'S STATES, ESTABLISH A COMMUNIST WORLD GOVERNMENT WITHOUT NATIONAL BOUNDARIES, A WORLD GOVERNMENT WILL GIVE THE GLOBALISTS ABSOLUTE CONTROL OVER ALL THE WORLD'S RESOURCES & POPULATION.
• CHIP ALL PEOPLE WITH RFID-IMPLANTS TO HAVE TOTAL CONTROL OVER US.

PIXTELLER.COM

NEW WORLD ORDER
UN Agenda 21/2030 Mission Goals

One World Government
One World cashless Currency
One World Central Bank
One World Military
The end of national sovereignty
The end of ALL privately owned property
The end of the family unit
Depopulation, control of population growth and population density
Mandatory multiple vaccines
Universal basic income (austerity)
Microchipped society for purchasing, travel, tracking and controlling
Implementation of a world Social Credit System (like China has)
Trillions of appliances hooked into the 5G monitoring system (Internet of Things)
Government raised children
Government owned and controlled schools, Colleges, Universities
The end of private transportation, owning cars, etc.
All businesses owned by government/corporations
The restriction of nonessential air travel
Human beings concentrated into human settlement zones, cities
The end of irrigation
The end of private farms and grazing livestock
The end of single family homes
Restricted land use that serves human needs
The ban of natural non synthetic drugs and naturopathic medicine
The end of fossil fuels

AGENDA 2030
NEW WORLD ORDER
17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
DEPOPULATION AGENDA

1 WELFARE DEPENDENCE
2 GMO/CODEX ALIMENTARIUS
3 FORCED VACCINSTIONS
4 MASS INDOCTRINATION
5 DESTROY FAMILY
6 WATER RETIONING
7 SMART GRID SURVEILLANCE
8 NO PROPERTY RIGHTS
9 SLAVE LABOR
10 COMMUNISM
11 PRISON LIKE CITIES
12 ONE CURRENCY
13 ENERGY RETIONING
14 CONTROL WILDLIFE
15 CONTROL RESOURCES
16 PERPETUAL WAR
17 ONE WORLD GOVERNMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NEW WORLD ORDER

TO ENSLAVE HUMANITY UNDER
THE AUTHORITY OF THE ANTICHRIST

পর্ব ৯

মুসলিমদের সুদিন কবে ফিরবে ⁉

সিরিজটায়, আসন্ন দিনগুলোর ভয়াবহতা সম্পর্কে আপনাদেরকে যথাসাধ্য বলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, পয়েন্ট বাই পয়েন্ট বুঝিয়েছি - অনেকেই সতর্ক হচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ! বাকিরা যে তিমিরে সে তিমিরে, যাহোক হেদায়েতের মালিক আল্লাহ, আমরা কেবল নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পুরণ করতে পারি যা আবশ্যক, যেন জবাবদিহি করতে না হয়, আমি তাই করছি, এর বেশি কিছু নয় ।

.

তো আজকের আলোচনা, শিরোনাম দেখেই বুঝতে পারছেন যে, আমরা মুসলিমরা যে ভীষণ কাপুরুষের ন্যায় দিন কাটাচ্ছি - এত এত বিপদ ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে, কি হবে আমাদের? এভাবেই চলবে? আমাদের কি মুক্তি নেই? আমরা কি পুনরায় বিজয় অর্জন করব না? হা, অবশ্যই এবং শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ । আজ সামান্য আলোচনা করব মুজাদ্দিদ ও বিজয় নিয়ে ।

মুজাদ্দিদ (আরবি: مجدد) শব্দের অর্থ দ্বীনের সংস্কারক। প্রতি হিজরী শতাব্দিতে মুসলিম সমাজ সংস্কার, মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত অনৈসলামিক রীতির

মূলোৎপাটন এবং ইসলামের প্রকৃত আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হন যিনি তাকে শরীয়তের পরিভাষায় মুজাদ্দিদ বলে।
মানুষ যখন ধর্ম বিমুখ হয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ও শয়তানের অনুসরণ শুরু করে, নৈতিক ও জাতীয় জীবন হয় কলুষিত, তখন তাদের হিদায়েতের প্রয়োজনে আল্লাহ্ তায়ালা বিশেষ দায়িত্ব সহকারে তাঁর তরফ থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

হাদীসে বলা হয়েছে,
"আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের (কল্যাণের) জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দ্বীনকে সংস্কার করবেন।"
(মিশকাতুল মাসাবিহ্ ২৪৭, আবু দাউদ ৪২৯১)

আমরা মুসলিমরা বীরের জাতি, এই জাতি পরাজয়ে বেশিদিন থাকে না, আল্লাহ'র জমিনের বান্দারা প্রতি শতাব্দীর শুরুতেই পুনরায় খিলাফত অর্জন করে নেয় ও তার জন্য রবের পক্ষ থেকে মনোনীত প্রতিনিধি আসে।
.
মুসলিমদের সর্বশেষ খিলাফত উসমানী খিলাফত ধ্বংস হয়ে যায় ১৯২৪ সালে, এখানে অনেকেই হিসাবে ভুল করেন ইংরেজি সন কাউন্ট করে, অনেকেই ১৯২৪ এর সাথে ১০০ যোগ করে বলেন, খিলাফত ২০২৪/২০২৫ এ

আসবে। আসলে তা নয়, আল্লাহর জমিনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান মানতে হবে, হিসাবের বেলায়ও তাই, সেকারেণই হিসাবটা হবে হিজরি সনে। আর, হিজরি সন অনুযায়ী যা ১০০ বছর, ইংরেজি সন অনুযায়ী তা ৯৭.২ বছর।

এবার হিসাব করে যে সাল আসলো তাতে অবাক হলেন?
ওয়া আল্লাহু আ'লাম। আমি শুধু এখানে আজ আপনাদেরকে এইটুকুই বুঝাতে চাচ্ছি যে রবের পক্ষ থেকে খুব শীঘ্রই আমাদের বিজয় আসবে ইনশাআল্লাহ - তাই দাজ্জালের চ্যালা-প্যালা যতই পরিকল্পনা করুক, যতই বাস্তবায়ন হোক, শেষ বিজয়টা মুসলিমদেরই হবে ইনশাআল্লাহ এবং তা আসন্ন।

(দ্রষ্টব্যঃ সেই মুজাদ্দিদ ; ইমাম মাহদি হবেন কিনা সেটা আল্লাহই ভাল জানেন, হতেও পারেন, নাও হতে পারেন)

এ তো গেলো বিজয়ের প্রতিশ্রুতি, কিন্তু তাতে অবস্থা কতটা পাল্টাবে? এ বিজয় তো সমগ্র ভূখন্ডে আসবে না কেননা এখনো ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ ঘটেনি, উনার সময়ে পৃথিবীতে খিলাফত নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ, এরপর আবার দাজ্জালের চুড়ান্ত আত্মপ্রকাশ, পরপরই ঈসা আঃ ইত্যাদি নানাবিধ ঘটনা যা ইনশাআল্লাহ দূরে নয়....

মাহদির আগমণের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিমদের চরম বেহাল অবস্থা বজায় থাকবে, এমনকি এখন যা আছে তার চেয়ে ক্রমশ খারাপ হতে থাকবে ও খুবই করুণ এক সময়ে মাহদির আত্মপ্রকাশ ঘটবে ইনশাআল্লাহ। [এসকল কথা গ্রহণযোগ্য সব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, বিস্তারিত আলোচনা করব ইমাম মাহদি সিরিজে - ইনশাআল্লাহ]

অবস্থা যতটাই পরিবর্তন হোক - আমাদেরকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে শক্তভাবে প্রস্তুত হতে হবে, এই উম্মাহ'র চরম খারাপ সময় চলছে, সবকিছু ইনডিকেট করছে যে বিজয় আসন্ন ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু কথা হচ্ছে, **"" আমরা কি বিজয়ী দলে শামিল হতে পারব? দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অংশ নিতে পারব? হতে কি পারব আল্লাহর সৈনিক? / নাকি এখনের মতই ঘুমে ডুবে থেকে ক্রমশ নিষ্পেষিত হতে হতে নিঃশেষ হয়ে যাব? অতঃপর মুনাফিকের মৃত্যু*....প্রশ্ন থাকলো - আপনি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চান? ""**

(*)"যে ব্যক্তি মারা গেলো অথচ সে জিহাদ করেনি ও জিহাদ করার মানসিকতাও রাখেনি সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করলো", [মুসলিম, ৩৫৩৩]

পর্ব ১০

শেষ জামানার ভয়াবহতা মোকাবিলায় কিছু নাসীহাহ ও করণীয়ঃ

বিগত ২০ পর্বে এবছর ও সামনের দিনগুলোতে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। যারা সম্পুর্ন সিরিজটি পড়েছেন, ইনশাআল্লাহ তারা অনুধাবনে সক্ষম হয়েছেন, অবশ্য এটি হেদায়েতের ব্যাপার যা আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন, নাহলে যতই পড়েন ; লাভ নেই।

যাহোক, অনেকেই আবেদন করছিলেন যে ঠিক কীভাবে কি করবেন এ জামানার মোকাবিলায় - সেই তাগিদ থেকেই আজকের আলোচনা।

আজ, গোটা কাফির বিশ্ব মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে পরিকল্পনা মাফিক আমাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত একের-পর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, চতুর্দিক থেকে যেন কুফফার বাহিনী দ্বারা পর্যুদস্ত আমরা, ধেয়ে আসছে মহাবিপদ, হক্ব ও বাতিলের লড়াই চলছে, ক্রমাগত মুত্তাকি ও মডারেট-মুনাফিক-নামধারী মুসলিম ; দুই শ্রেণী ক্রমশঃ আলাদা হয়ে যাচ্ছে । এমতাবস্থায় ঈমান নিয়েই যেন টানাটানি, তাগুতের গোলামি করে জিন্দেগী পার করছে আজ মুসলিম উম্মাহ - এভাবে চলতে পারে না, বিগত পর্বে বলেছি যে উম্মাহ'র বিজয় আসন্ন ইনশাআল্লাহ ।

.

তো, ঠিক কীভাবে আপনি নিজেকে শুদ্ধ পথে রাখবেন? ::---

◍ কেন এসেছেন এদুনিয়ায়?

পবিত্র কুরআন এ আল্লাহ্ বলেন,

"জ্বীন ও মানব জাতিকে আমি (আল্লাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" [সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত ৫৬]

.

পেলেন উত্তর? বলুন, আজ ফজর পড়া হয়েছে?

বয়স ১২ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যত বছর পার হয়েছে তত বছরের সাথে (৩৬৫×৫=১৮২৫) গুণ করুন, এরপর এবছরের হিসাব আলাদা করে সবটা যোগ করুন, তাহলে আপনার জীবনে মোট ফরজ সালাতের ওয়াক্তের সংখ্যা পাবেন, (লিপ ইয়ার অনুযায়ী কয়েকদিন যোগ হবে) নিজেরটা নিজে হিসাব করে দেখুন ও জবাব প্রস্তত করুনঃ- " আপনি কতবার নিজ মালিকের হক্ব নষ্ট করেছেন?" , দিতে পারবেন কোনো জবাব?

.

আপনি হিসাব না রাখলেও দুই কাধের ফেরেশতারা কিন্তু ঠিকই আপনার জীবনের সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্ম সব কৃতকর্মের হিসাব রেখেছে !

.

অতএব কোনোভাবেই ফরজ ইবাদতে অবহেলা করবেন না, আমৃত্যু ইহা বজায় রাখবেন। ও যথাসম্ভব নিজেকে সর্বপ্রকার পাপ থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন, বেশি বেশি তওবা-ইস্তেগফার করবেন, কান্নাকাটি করবেন, কথা বলবেন আল্লাহর সাথে ।

ঈমান ও সহীহ আক্বীদাঃ

দাজ্জালের ফিতনার কারণে আজ অধিকাংশ মুসলিমের ঈমানই নিবুনিবু - এমতাবস্থায় শেষ পর্যন্ত তারাই ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে যারা শুরু থেকেই সচেতন ছিল।

.

এর জন্য দরকার সহীহ আক্বীদা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ; এটি এমন কিছু যা অর্জন সহজ নয় , হক্ব-বাতিলের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারাটা জটিল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন কেননা আলেমদের অবস্থাই এখন বড় করুণ, সাধারণের কথা বলাই বাহুল্য।

.

ঈমান তরতাজা করা জরুরী, বিধায় প্রতিদিন যতটা পারা যায় বেশি বেশি আমল করা আবশ্যক, যেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরী হয় ও ঈমানের নূর বৃদ্ধি পায়।

.

হক্ব-বাতিল শনাক্ত করতে পারাটা জরুরী, এটা এমন এক বিষয় যা কেউ কাউকে শিখাতে পারে না আসলে, এটা অন্তরের নেক নিয়ত ও দু'আর মাধ্যমেই কেবল লাভ করা সম্ভব।

.

ইসলাম এক সার্বজনীন জীবন বিধান যেখানে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রের করণীয় সম্পর্কে সম্যক বিধিনিষেধ বলে দেয়া আছে - যথাসম্ভব সেসব মেনে চলা দরকার, রাসুল সাঃ এর সুন্নতের উপর গুরুত্ব দিতে হবে, মনে রাখবেন, রাসূল সাঃ এর শাফায়াত ব্যতিত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না ।

.

এভাবেই আপনি ধীরে ধীরে একজন প্রকৃত মুসলিম হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ

- শেষ জামানার জ্ঞান অর্জনঃ

যেহেতু আমরা দেখতেই পাচ্ছি কিয়ামতের প্রায় সব ছোট আলামত পুরণ হয়ে গেছে, ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশও নিকটে ইনশাআল্লাহ ; যার মধ্য দিয়ে বড় আলামতগুলোও একে একে প্রকাশ শুরু হবে ইনশাআল্লাহ - তাই ইহা নিসন্দেহে বলা যায় আমরা শেষ জামানার বাসিন্দা ও দাজ্জালের যুগে পড়ে গেছি। বিধায়, ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি কিয়ামত-

ফিতনা ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানার্জন একেবারে আবশ্যক কাজ, সবার জন্য।

.

তিলাওয়াতের পাশাপাশি অর্থসহ কুরআন পড়ুন ও হাদিস পড়ুন বেশি বেশি (উত্তম কারো সান্নিধ্যে থেকে), কিয়ামত সংক্রান্ত বইগুলো কিনুন, নিজেরা পড়ুন, বাসার সবাইকে পড়ান ; সবাইকে। নিজে সতর্ক হোন ও অন্যদেরও সতর্ক করুন। হ্যা, আমি দাওয়াহ'র কথাই বলছি। আপনি ইসলাম সম্পর্কে যতটুকুই শুদ্ধ জ্ঞান রাখেন ততটুকুরই দাওয়াত দিন, ধীরে ধীরে যত পারুন অধ্যয়নের পরিমাণ বাড়ান। হক্বানী আলেমদের সান্নিধ্যে থেকে করতে পারলে কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কিন্তু তাদের পাওয়াটাই বড় দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে - সমস্যা এখানেই। তাগুতের পা চাটা গোলামে পরিণত হয়েছে তাদের অনেকেই, প্রকৃত মুসলিম এর ন্যায় প্রকৃত আলেম এখন খুব খুব খুবই কম।

.

যাহোক, রবের সাথে নিজের সম্পর্ক গড়ে তোলাটাই মূখ্য,
"প্রত্যেক কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল" [বুখারী, ১]
অতএব, নিয়তটা উত্তম রাখুন, বাকি আল্লাহই সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ।

◍ সিরিজ যারা পড়েছেন তাদের জন্যঃ

কোনোভাবেই ভ্যাক্সিন নেয়া যাবে না, যেভাবে পারেন এভোয়েড করবেন,

চিপ-ক্রিপ্টোকারেন্সি এদেশে আসতে তুলনামূলক একটু দেরি হবে (ওয়া আল্লাহু আ'লাম) তবে ভ্যাক্সিন নিয়ে এখনি বিশাল তোরজোর শুরু হতে যাচ্ছে। সাবধান, হে আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আল্লাহর কসম, আমি এই উম্মাহ'র কল্যাণ-ই চাই, আমি কখনই চাইনা আমার ভাই-বোনেরা কাফিরদের এসব ষড়যন্ত্রে আটকা পড়ুক, সেজন্যই এত করে বলি আপনাদের বারবার, এগুলো সবই আমাদের দুর্বল করার সুবিশাল চক্রান্ত।

.

দরকারে আপনারা এস্তেখারার সালাত আদায় করতে পারেন, তবুও, মিনতি রইল, "ভ্যাক্সিন নেবেন না", জেনে-বুঝে বিষ নিয়েন না, পরিবারের কাউকে নিতে দেবেন না, সবাইকে বুঝাবেন, মানা করবেন, অনেক কথা শুনতে হবে, নিমিষেই এক গামলা উপাধি জুটে যাবে - কিচ্ছুর পরোয়া করবেন না, আপনি এর ফল পাবেন ইনশাআল্লাহ, তবুও অন্যদের সতর্কে এগিয়ে আসুন, একটা বিপ্লব গড়ে তুলতে হবে আমাদের।

আর সিরিজের বাকি পর্বগুলোর জন্য কমন সেন্স দ্বারাই বুঝবেন ইনশাআল্লাহ , যদি সবগুলো পড়ে থাকেন। বিশেষ কিছু বলার নেই, আদ্যোপান্ত বুঝানোর চেস্টা করেছি, যতটুকু এখানে দেয়া সম্ভব দিয়েছি - প্রকৃতপক্ষে , ফেসবুকে এইটুকু দেয়াটাই নিরাপদ না, এর বেশি দিলে বিশাল সমস্যা। বিধায় অনেক অনেক কিছুই আপনাদের জানাতে পারিনা, চাওয়া সত্ত্বেও না - সেকারণেই

ভবিষ্যতে ব্লগে ট্রান্সফার হবো ইনশাআল্লাহ, তার আগ পর্যন্ত আমার অন্যান্য গ্রুপগুলোর মাঝে এই গ্রুপটা তুলনামূলক স্পেশাল সার্ভার হিসেবে পাবেন ইনশাআল্লাহ , stay connected.

[ফিতনাময় দুনিয়া (UNSYSTEMATIC WORLD)]

◍ শেষ কথাঃ

এবারো, আমি মূল আলোচনা গুলোই করেছি। সম্পুর্ন ব্যাসিক আলোচনা, মনে তো চায় ধুমায়া লিখি আপনাদের জন্য, যত গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে বলি, কিন্তু ভাই, বড় কঠিন অবস্থায় আছে এই উম্মত...পদে পদে বাধা-বিপত্তি।

.

আসলে, যত দিন যাচ্ছে ; দুটো দল ভাগ হয়ে যাচ্ছেঃ হক্ব বনাম বাতিল। একটা দল হবে মাহদির সৈনিক, আরেকটা দল হবে দাজ্জালের সৈনিক (+ ভিক্টিম)

.

সময় বেশি নেই ভাই, " কাফেলা আপনার জন্য বসে থাকবে না" - (কথাটা গভীর, বুঝে নেয়ার চেস্টা করবেন - এই এক কথায় শত শত বাক্য নিহিত, বুঝতে পারলে এই একটা কথাই জীবন পালটে দিতে পারে, ও উপরের প্যারাটা হিন্ট, এবং গত পর্বের শেষ প্যারাটাও পুনরায় দেখে আসতে পারেন)। হক্ব চিনতে হলে নিজেকে আগে হক্বের উপর রেখে জীবন চালাতে হবে, তবেই

সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন, ফিতনা ধরতে পারবেন ইনশাআল্লাহ , তা না হলে ঐ নিবুনিবু ঈমানটাও অজান্তেই ফুস করে চলে যেতে পারে (আল্লাহ্ না করুক)

.

তা আপনি কোন দলে শামিল হয়ে মারা যাবেন সেটাই ভাবুন বেশি করে ও প্রস্তুত হোন তারই । হাশরে আপনার প্রতিটা কাজ-কর্মের যথাযথ হিসাব দিতে হবে আল্লাহকে, যত নিয়ামত ভোগ করছেন, সবকিছুর জবাব দেয়া লাগবে ; যে, কোন নিয়ামতকে আপনি কোথায় কীভাবে ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরুপ, কারো চোখ রাতে অশ্লীল চিত্রে ডুব দেয়, কারো চোখ তার রবের ভয়ে কাদে।

দুটো মানুষ সম্পুর্ন ভিন্ন, মানুষদুটোর গন্তব্যও ভিন্ন (হেদায়েত না পেলে)।

আরেকটা কথা, এদেশের মুসলিমরা তুলনামূলক চরম সুখে আছে, কিন্তু সুখ বেশিদিন আর সইবে না - হাদিস মোতাবেক, এই উপমহাদেশের মানুষদের উপর চরম কঠিন সময় আসতে চলেছে, রক্তের ফোয়ারা বইবে । [সচেতন বান্দারা বুঝে গেছেন।

শেষ কথা ওটাই যে আপনি কোন দলে শামিল হয়ে রবের কাছে যাবেন - সেটাই নির্ধারণ করবে আপনার চিরকালের জীবনের গন্তব্য । কেয়ারফুল !

আমার মাঝে যা কিছু কল্যাণকর সবটুকু আমার রবের পক্ষ থেকে, ও যা কিছু অকল্যাণকর তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। ও এখানের সংগ্রহীত লিখাগুলোর উৎসসমূহকে রব উত্তম প্রতিদান দান করুক ।

আপনাদের সবার জন্য আন্তরিক দু'আ রইল

.

আমার জন্য বিশেষ দু'আ করবেন, অনুরোধ রাখলাম ।

যদি এখানের কোনো কিছু থেকে আপনি সামান্যতমও উপকৃত হোন, তাহলে মালিকের নিকট এই অধমের জন্য দু'আ করতে ভুলবেন না ।

জাযাকাল্লাহু খাইরান ।

সিরিজ সমাপ্ত ।
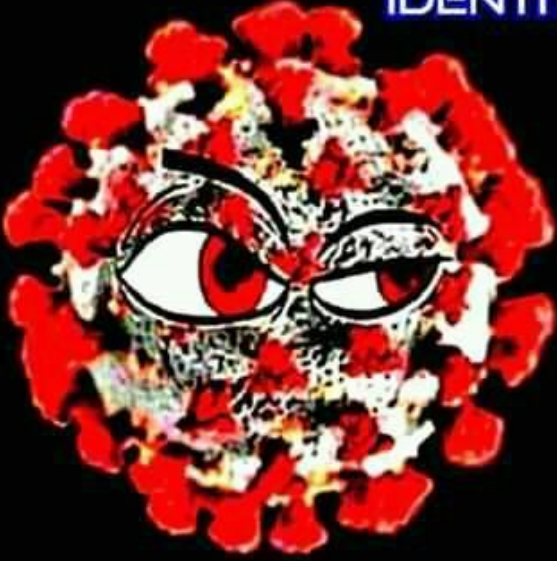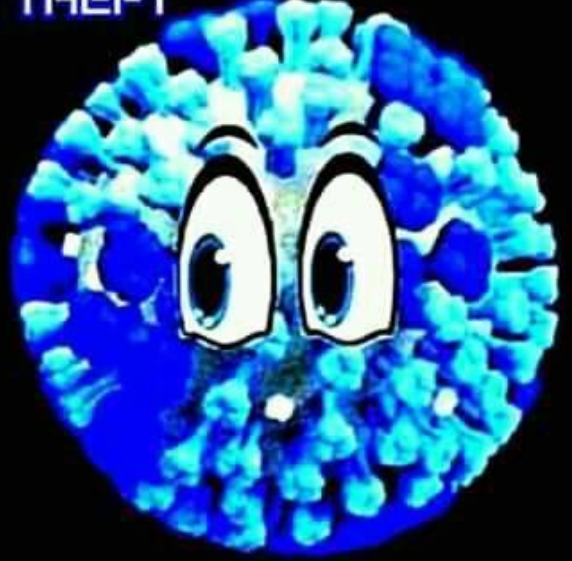
সমস্যা আগেও ছিল, এখনো আছে, নতুন কিছুই নেই যা মিডিয়া আপনাদের গিলিয়ে দিচ্ছে
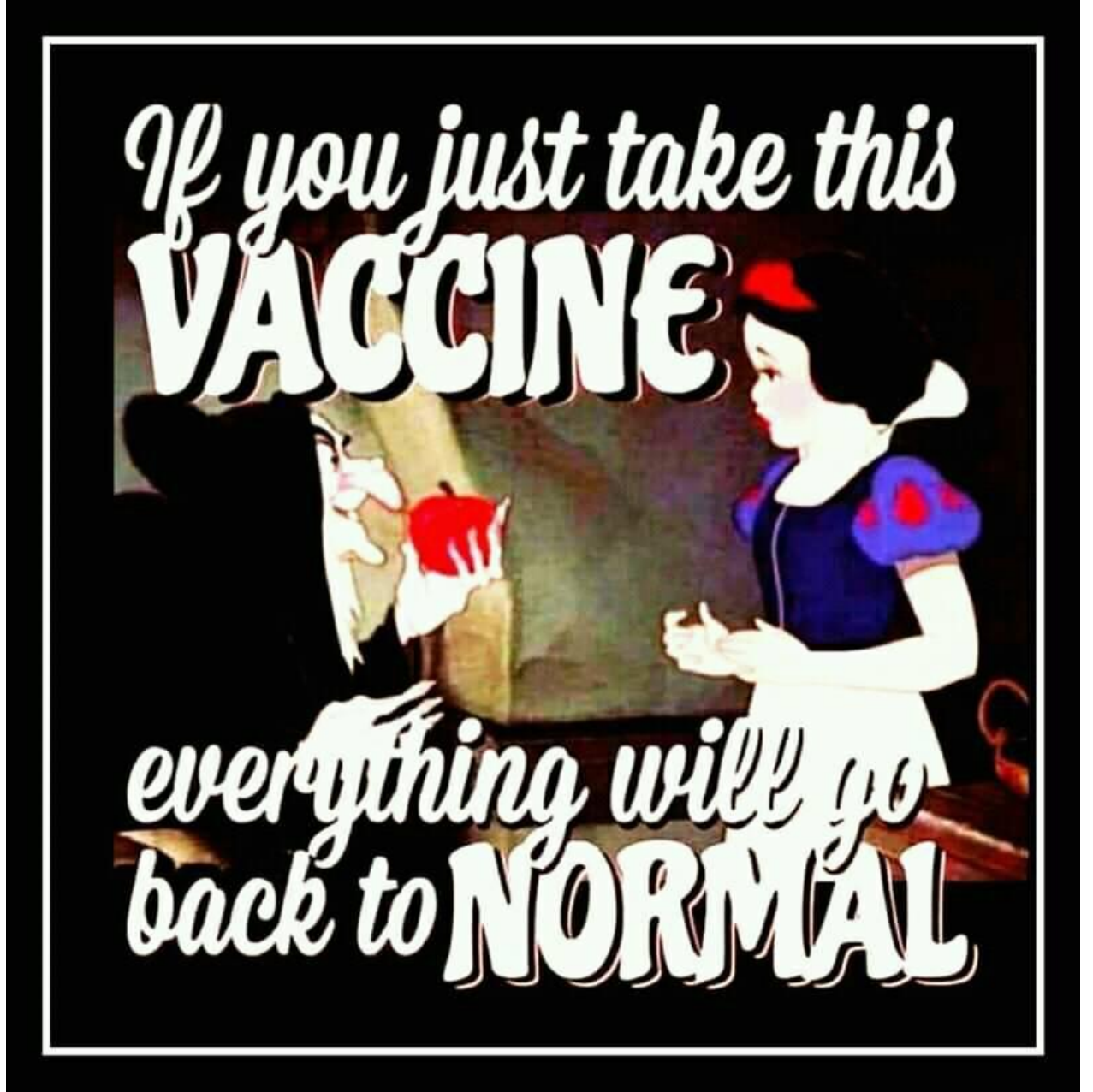
একদম সাজানো নাটক, বরাবরের মত এবারো তারাই সমস্যা দেখিয়ে তারাই সমাধান দেখাচ্ছে, সাবধান !

অনুধাবনে সক্ষম হেদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তিরাই সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, রব আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক